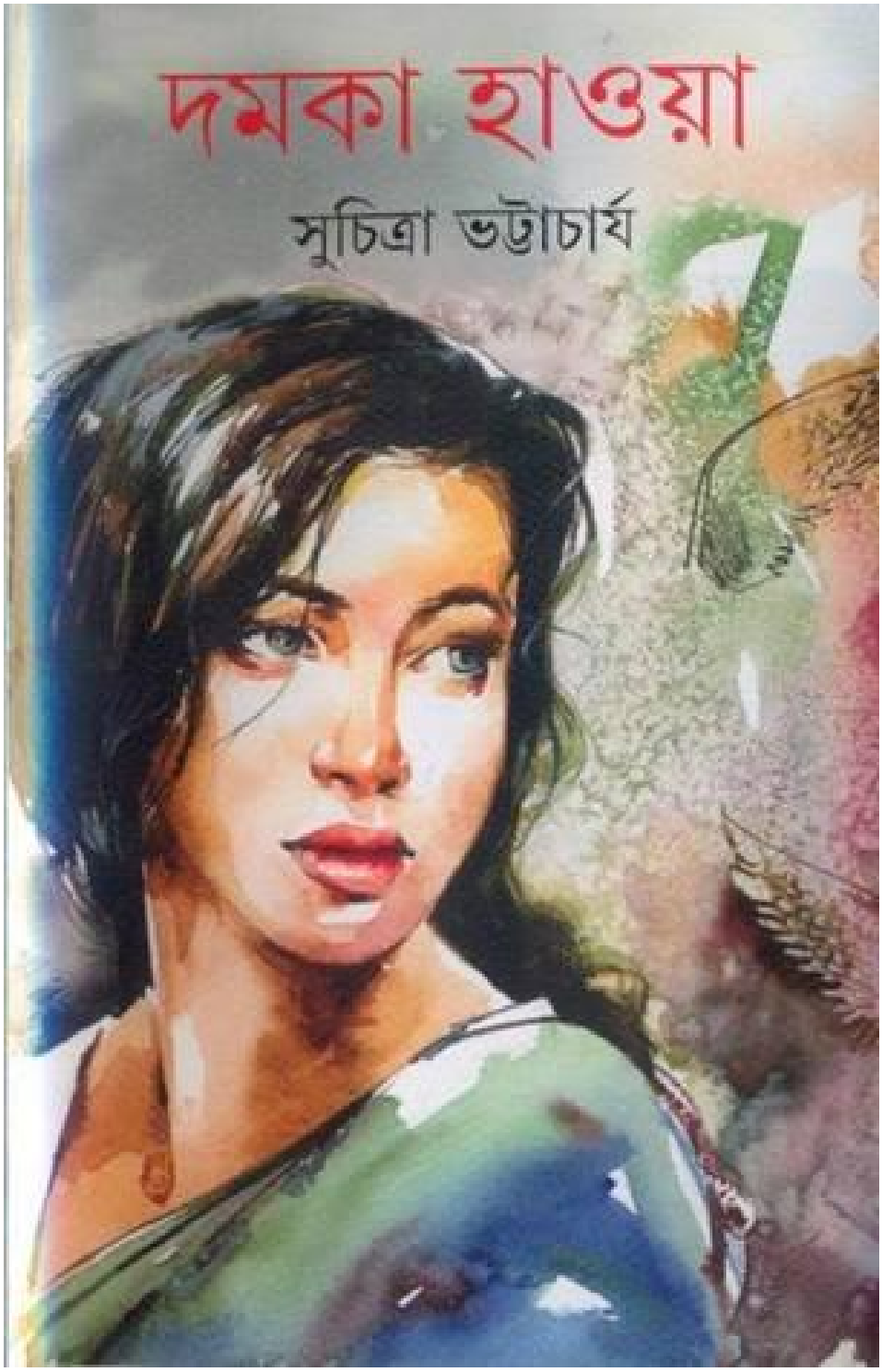

দমকা হাওয়া

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

০১. শ্রান্ত পায়ে হাঁটছিল অহনা

অরূপ আচার্য-কে

.

ট্রেন থেকে নেমে শ্রান্ত পায়ে হাঁটছিল অহনা। কলকাতা গেলে সারাদিন এত ধকল যায়, ফিরতিপথে শরীর যেন আর চলতেই চায় না। বিশ্রী একটা হাঁপ ধরে বুকে, মাত্র এই আটত্রিশ বছর বয়সেই। তারপর ক'দিন ধরে যা গরম! জৈষ্ঠ্যের এই রুটিসেঁকা তাতে প্রাণশক্তি তো এমনিই নিঃশেষ।

কলকাতার কাজটাজগুলো ঠিকঠাক মতো হলে তাও সান্ত্বনা থাকত খানিকটা। তা সে গুড়েও তো বালি। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সদর দপ্তরের যে অফিসারটির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া, তিনি আজ ডুব। অফিসের অন্য কোনও কর্মচারীও হয়তো সমস্যাটার সমাধান করতে পারত, কেউই তেমন গা দেখাল না। এ ওকে আঙুল দেখায়, ও একে। সরকারি অফিসের তো এটাই রেওয়াজ। অগত্যা চলো অন্য কাজে, অফিসপাড়া ছেড়ে থিয়েটার রোডে। পুনের সোলারিস কোম্পানির পূর্বাঞ্চল শাখায়। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের কয়েকটা নতুন ডিজাইনের প্যানেল দেখানোর কথা ছিল আজ। কপাল খারাপ থাকলে যা হয়, এখনও নাকি নমুনাই এসে পৌঁছোয়নি। মিলল খালি একটি তথ্যজ্ঞাপক পুস্তিকা যা নাকি ইন্টারনেট থেকেই ডাউনলোড করে নেওয়া যায়। অর্থাৎ পুরো পরিশ্রমটাই বৃথা, অহনার আজ দিনটাই বরবাদ। কোনও মানে হয়?

অহনার ঠোঁটে একচিলতে কষ্টের হাসি ফুটে উঠেও মিলিয়ে গেল। প্রতিটি পরিশ্রমই যার কাছে পণ্ডশ্রম, বেঁচে থাকাটাই যার নিছক সময়ের অপব্যবহার বলে মনে হয়, একটা নিষ্ফলা দিনে তার কীই বা যায় আসে?

প্ল্যাটফর্মে সার সার সেলুন। সবে বৈকালিক ঝাঁপ খুলছে একে একে। মফস্‌সলের এক স্টেশন চত্বরে কেন যে এত চুল কাটার জায়গা কে জানে! টিয়াডাঙায় ডেরা বাঁধার পর প্রথম প্রথম উঁকি দিত প্রশ্নটা,

এখন অহনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছে। জীবনের বড় বড় প্রশ্নগুলোরই তো উত্তর মেলেনি, এই অকিঞ্চিত্কর কৌতূহলের জবাব খোঁজার কী প্রয়োজন। বরং মনটাকে প্রশ্নবিহীন করে রাখতে পারলে বোদা বোদা ভাবটায় স্বস্তি তো মেলে যা হোক।

সেলুনের সারি পেরিয়ে, টিকিট কাউন্টারের পাশ কাটিয়ে অহনা প্ল্যাটফর্মের বাইরে এল। স্টেশনের লাগোয়া রামুর গ্যারেজ, নিত্যযাত্রীদের দ্বিচক্রযানে বোঝাই। পয়সা মিটিয়ে নিজের মোপেডখানা সেখান থেকে নিল অহনা। অন্য দিন পাহারাদার ছেলেটার সঙ্গে হাবিজাবি কথা বলে দু'-চারটে, আজ ইচ্ছে করছে না। ব্যাটারিচালিত বাহনটি নিয়ে সটান রাস্তায়। স্টার্ট দিয়েছে।

সামনেই টিয়াডাঙার পাইকারি বাজার। মরশুমি সবজির। হরেনবাবুর আড়তে প্রকাণ্ড পাল্লায় ঝিঙে-পটল ঢেঁড়শের স্তূপ। উঠছে, নামছে, ঝপাঝপ বস্তাবন্দি হচ্ছে খেতের ফসল, ট্রেনে-ট্রাকে-ভ্যানে-অটোয় বোঝাই হয়ে পাড়ি দেবে কাছাকাছি বাজারে। দূর-দূরান্তরেও। টিয়াডাঙার ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র চিরে ধীর গতিতে এগোচ্ছে অহনার দুধসাদা মোপেড। দু'পাশে দোকানের পর দোকান, কেউ বা নিজের নিয়মে ব্যস্ত, কেউ বা অলস আড়মোড়া ভাঙছে। এখনও শিবানী ফার্মেসি খোলেনি, আজ শুক্রবার বোধহয় একবেলা বন্ধ, বাইরেটায় চাটাই পেতে তাসে মগ্ন প্রবীণের দল। অল্পবয়সি ছেলে-ছোকরারা আড্ডা মারছে উচ্চকিতে, ছোট ছোট জটলায়। বড্ড পরিচিত দৃশ্য, বড় একঘেয়ে।

জমজমাট জনপদটা অতিক্রম করে এসে অহনা একটা আলগা শ্বাস ফেলল। তার নিজের জীবনই বা কী এমন বৈচিত্র্যময়। ঘুম ভাঙা থেকে শুরু করে রাতে শুতে যাওয়া, সবটাই কি ছকে বাঁধা নয়? শুধুই তো গোটাকতক রুটিনমাফিক কাজ, যা সে করে চলেছে গত সাড়ে পাঁচ বছর। মাঝেমধ্যে কোনও উত্তেজনার কারণ ঘটে হয়তো, তবে সেও তো ছকেরই অঙ্গ। সমিতির মেয়েদের সমস্যার অন্ত নেই, নানান ঝঞ্ঝাটের সাতকাহন তারা শোনায় বটে, কিন্তু তার মধ্যেও কোনও বৈচিত্র্য আছে কি? একই

কাহিনি যেন আলাদা আলাদা মুখ থেকে শোনা! আচমকা চিন্তায় ছেদ। সর্বনাশ, শেফালিদেবীর প্রেশারের ট্যাবলেটটা তো ভুলে মেরে দিচ্ছিল প্রায়! একবার শুধু জানিয়ে দিয়েছে ওষুধ শেষ, এখন সারাক্ষণ শুধু তক্কে তক্কে থাকবে মা। অহনা না নিয়ে গেলে খুশিই হবে সম্ভবত। উদাস মুখে বাক্যবাণ ভাসিয়ে দেওয়ার অপ্রাকৃত সুখটুকু মিলবে যে!

কী আশ্চর্য মানসিকতা! যে মেয়েকে ছাড়া শেফালিদেবীর চলবে না, সেই মেয়েকেই কিনা হেনস্তা করবেন প্রতি পদে? চটেমটে অহনা যদি দুটো কড়া কথা শুনিয়েই ফেলে, আর রক্ষে আছে? এমন একটা আচরণ করবেন, যেন টিয়াডাঙায় এনে তাঁর উপরে চরম অত্যাচার চালাচ্ছে অহনা! শুধু তাই নয়, মেয়ের সঙ্গী হয়ে টিয়াডাঙায় বসবাস করে তিনি যে হতভাগিনী দুঃখিনী অহনার লাগাতার উপকার করে চলেছেন এবং করতেই থাকবেন, এটিও স্মরণ করাতে ভোলেন না কখনও।

অথচ সত্যিটা হল এই যে, অহনা খুব একটা চায়নি মা তার লেজে লেজে টিয়াডাঙায় আসুক। ভেবেছিল, এখানে সে একা থাকবে, একা একাই নাড়াচাড়া করবে তার ঘেঁটে যাওয়া অতীত, একা একাই সাজাবে ধূসর ভবিষ্যৎ। এবং যে কাজটা সবচেয়ে বেশি জরুরি, মুখোমুখি হবে নিজের। কোনওটাই যে সে ঠিকমতো করে উঠতে পারল না, সে তো ওই শেফালিদেবীর কারণেই।

ব্রেক চেপে থামল অহনা। মোপেড সাইড করে ঢুকেছে পপুলার ড্রাগ হাউসে। দোকানটার স্টক ভাল, পাঁচ থেকে দশ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেয়, এখান থেকেই সে ওষুধ নেয় সাধারণত।

“কাউন্টারের টাকমাথা লোকটি একগাল হেসে বলল, দিদি বুঝি ফিরছেন?”

“হুঁ।...প্রেশারের ওষুধটা দেবেন তো। তিন পাতা।”

তাক থেকে বাক্স নামাল লোকটা। ডালা খুলে হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, “এ মাসে ঘুমের ট্যাবলেট তো নিলেন না দিদি?”

অহনা বলতে পারত গত মাসে বেশি করে নিয়েছিল, এখনও ফুরোয়নি। জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। ঢাউস ব্যাগ খুলে টাকা বের করছে।

লোকটা ফের বলল, “কলকাতা গিয়েছিলেন বুঝি?”

অহেতুক কৌতূহল। অহনা তো এখানে নতুন নয়, সে কী করে, না করে তাও জানে সব্বাই, নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াতও লোকচক্ষুর অগোচরে ঘটে না, তবু যে কেন এই গায়ে পড়ে খাজুরা? নাকি তাদের মা-মেয়ের টিয়াডাঙায় এসে বসবাসের মধ্যে এখনও রহস্যের গন্ধ রয়ে গেছে?

লোকটার প্রশ্নমালা শেষ হয়নি, আবার বলল, “আজ নাকি শিয়ালদার কাছে কী সব গোলমাল হয়েছে? দুপুরে টিভিতে দেখাচ্ছিল... পুলিশ নাকি লাঠি চালিয়েছে...?”

তাই কি মৌলালির মোড়টায় একটা ভিড়মতো ছিল। রাজনৈতিক কোনও বখেড়া? হবে বা। রাজনীতির যা চেহারা হয়েছে এখন, ও নিয়ে ভাবতেও গা গুলোয়।

প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দু’খানা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিল অহনা। নীরস স্বরে বলল, “কত হল দেখুন।”

“হ্যাঁ, এই তো...।” টাকাটা নিল লোকটা। হিসেব করে বাকি পয়সা ফেরত দিতে দিতে বলল, “আপনার গাড়িখানা কিন্তু খাসা হয়েছে দিদি। ধোঁয়া নেই, ভটভট শব্দ করে না, শাঁ শাঁ নাই ছুটুক, দিব্যি ফুরফুর যাচ্ছে...”

অহনা ব্যাগের চেন লাগাচ্ছিল। অস্ফুটে বলল, “হুঁ।”

“একটা কথা বলি দিদি?”

ওফ, এখনও একটা কথা ফুরোয়নি! মানুষ কেন যে বোঝে না, কখন থামতে হয়?

অহনা চোখ তুলে তাকাতেই লোকটা বলল, “আপনি মাঝে একটা সাইকেল নিয়ে ঘুরতেন, কেমন চোখে লাগত। এই বাহনটি কিন্তু বেশ, আপনাকে ভারী মানাচ্ছে।”

শুনতে মন্দ লাগল না অহনার। মনে মনে হাসলও একটু। সাইকেল কি সে অকারণে চাপত? মোপেড না কিনলে আর চলছিল না বলেই তো সেই আসানসোলের বালিকা বয়সে সাইকেল চালানোর অভ্যেসটা ক'দিন ঝালিয়ে নিচ্ছিল অহনা। তবে এই আধবুড়ি বয়সে সাইকেল আরোহিণী হিসাবে সে মোটেই তেমন দৃষ্টিলোভন নয়, এটা শুনে মোটেই প্রীত হল না।

অহনা কেঠো স্বরে বলল, "মানাক, না মানাক, আমার তো কাজের জন্য কেনা।"

"সে তো বটেই দিদি। আপনার তো আমাদের মতো এক জায়গায় বসে দাঁড়িয়ে কাজ নয়। অবিরাম চক্কর কাটছেন। আজ সাঁঝের হাট ছুটছেন, তো কাল মাজুলি...।" লোকটার কপালে এবার মৃদু কুঞ্চন, "তা ব্যাটারি কেমন খাচ্ছে দিদি?"

"কোম্পানি তো বলেছে তিন বছর যাবে। তার বেশি চললে কপাল।"

"ওইটাই আসল কথা দিদি। কপাল। কার যে কী আয়ু নির্দিষ্ট করা আছে কে জানে।"

লোকটা বড্ড বেশি বকছে তো? এক্ষুনি হয়তো গেঁয়ো দার্শনিক বুলি আওড়ানো শুরু করে দেবে। অহনারই বা কী আক্কেল, তালে তাল দিয়ে সে বকবক করছে কেন?

তাড়াতাড়ি দোকান ছেড়ে মোপেডে ফিরল অহনা। পুচকে খোপ থেকে বের করেছে হেলমেট। স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা রাস্তা মোটামুটি মসৃণ, তবে রাজ্য সড়কে পড়লে শিরস্ত্রাণের প্রয়োজন হবে।

অহনা সওয়ার হয়েছে মোপেডে, হঠাৎ লোকটা বেরিয়ে এল দোকান ছেড়ে। লজ্জা লজ্জা মুখে বলল, "দিদি, একটা দরকারি কথা আপনাকে জানাতে ভুলে গেছি।"

অহনা বিরক্তি চেপে বলল, "আবার কী হল?"

"আপনাকে একজন খুঁজছিল।"

"আমাকে?" অহনা ভুরু কোঁচকাল, "কে? কেন?"

“তা তো জানি না। দীপু-বাপি-সান্টুরা দাঁড়িয়েছিল... ওদের জিজ্ঞেস করছিল আপনার বাড়িটা কোথায়... কতদূরে... কীভাবে যেতে হয়...”

“অ। কখন?”

“এই তো...পাঁচটা নাগাদ। আমি সবে তখন দোকান খুলছি।”

“কোনও মেয়ে?”

“না দিদি। ইয়ং ম্যান। হাট্টাকাট্টা। পিঠে মোটা ব্যাগ। ওই যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা যেমনটা নিয়ে ঘোরে...”

কিঞ্চিৎ অবাকই হল অহনা। সমিতির কাজে তার কাছে হরবখত লোক আসে বটে, কিন্তু পিঠে রুকস্যাক চাপিয়ে...? সুশোভন স্যার পরশু বলছিলেন, কোনও একটা খবরের কাগজ নাকি অহনার সমিতির কাজকর্ম নিয়ে স্টোরি করতে চায়। আপত্তি ছিল অহনার, তার ছোট্ট সমিতির অতি সামান্য কাজকম্মো নিয়ে গপ্পো ফাঁদায় সে বরাবরই অনাগ্রহী, কিন্তু সুশোভন স্যারের নিশ্ছিদ্র যুক্তিজালের সামনে পড়লে অহনার অনিচ্ছে যে কুটোর মতো ভেসে যাবে এও তো অবধারিত। পরে অবশ্য অহনার মনে হয়েছে, তার আশাবরীর একটু-আধটু প্রচার হওয়া মন্দ নয়, প্রচারের আলো থাকলে সরকারি দফতরে অপরিচিতির লক্ষণরেখা পেরোতে তো সুবিধা হয়।

তা তারাই কেউ হানা দিল নাকি? ক্যামেরা ট্যামেরা সহ? কিন্তু তারা বিকেলে আসবে কেন? সদা ব্যস্তবাগীশ সুশোভন স্যার যতই বেখেয়ালি মানুষ হন না কেন, নিশ্চয় অহনার মোবাইল নম্বর তাদের দেবেন এবং তারাও আগে অ্যাপয়ন্টমেন্ট করে তবেই না লোক পাঠাবে?

তা হলে আর কে হতে পারে? স্যারের ছাত্রটাত্র কেউ? ডাটা কালেকশনে এসেছে? উঁহু, তা হলেও তো স্যার একটা ফোন করতেন। তা ছাড়া, তারাই বা এই অবেলায়, বিনা নোটিশে, কেন হাজির হবে? একমাত্র সেই মানুষটাই আচমকা এভাবে আসে...

ভাবনাকে বেশি গড়াতে দিলেই মুশকিল। চলতে থাকবে, বইতে থাকবে, অনন্ত ধারায় বিভাজিত হয়ে ঢুকে পড়বে অচেনা অপ্রিয় খাতে। বালি সরিয়ে তুলে আনবে এমন সব স্মৃতি, যেগুলো মগজের খোপে মরে গেলেই স্বস্তি পায় অহনা।

সুইচ টিপে অহনা চালু করল মোপেড। এবার ধীরে ধীরে ক্ষীণ হচ্ছে লোকালয়। ঈশানবাবুর বড় কাঠগোলা ছাড়িয়ে সামান্য বাঁয়ে হেলেছে পিচঢালা পথ, বটতলার তেমাথায় পৌঁছে ঘুরতে হবে ডাইনে। রাস্তা বলে আর প্রায় কিছুই থাকবে না তখন। এককালে হয়তো ইট পড়েছিল, এখন ভেঙেচুরে একশা। এমন এবড়োখেবড়ো ভাবেই চলে গেছে সেই গঙ্গায়। আলাইপুর ঘাটে।

বিকেল মরে আসছে ক্রমশ। দেখেশুনে সামনে-সুমলে এগোচ্ছিল অহনা। টাল খেতে খেতে। তবে নিয়মিত সাইকেল মোপেড চালিয়ে চালিয়ে তার হাত এখন মোটামুটি পোক্ত। একটু সমতল পেলেই তার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে সামনের আকাশে, প্রায় অভ্যাসের মতোই দেখছে বিশ্বচরাচর। পশ্চিম দিগন্তে আজ অল্প অল্প মেঘ। জলহীন। শেষ সূর্যের রশ্মি মেখে গাঢ় রক্তিম। বিষণ্ণ এক আলো ছড়িয়ে আছে দু'ধারের মাঠে, ছুঁয়েছে দূরের গাছ-গাছালিকে। দেখে মনে হয়, পাতলা রংজ্বলা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে কেউ। বিস্তীর্ণ ভূমি বিচ্ছিরি রকমের ন্যাড়া এখন। বোরো ধান শেষ, আউশ রোয়া হয়নি, এ যেন এক বিচিত্র বন্ধ্যা সময়। তৃষ্ণার্ত মাটি এখন বর্ষণের প্রতীক্ষায়।

ছোট্ট একটা কালভার্ট পার হল অহনার মোপেড। খানিকটা ঢাল বেয়ে নেমে অল্প একটু চড়াই। তার পরেই আলাইপুর মৌজা শুরু। বেশ বড় গ্রাম, স্থানীয় লোকরা এদিকটাকে বলে পূর্ব আলাইপুর। গোড়াতেই ডাইনে পর পর কয়েকটা দোকান। মুদিখানা, চা-তেলেভাজার ঠেক, জীবনবাবুর স্টেশনারি শপ। মোবাইল কোম্পানির ঝকঝকে সাইনবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে দোকান আর মালিকের নাম। বাড়িঘরও চলছে দু'পাশে। পাকা বাড়িই বেশি, কাঁচাও আছে মাঝে মাঝে। একটা দোতলা বাড়ির দেওয়ালে শ্যামাঙ্গিনী ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের অতিকায় সাইনবোর্ড, বিজ্ঞাপিত হচ্ছে সততা, নির্ভরতা।

বাড়িগুলোর পেছন ভাগে ছোট বড় সবজির খেত। পটল, ঝিঙে, শসা, কাঁচালঙ্কা...। নদীর ধারের ইটভাটায় দিনের কাজ ফুরোল, দলবেঁধে ফিরছে মেয়েরা। কলকল করতে করতে লুটিয়ে পড়ছে অকারণ হাসিতে। নিম-শিমুল-আম-কাঁঠালের ডালে আঁধার ঘনিয়ে এল।

এইসব মেয়ে বউদের দেখে অহনার ভারী অদ্ভুত লাগে। এদের প্রত্যেকের জীবনকাহিনি প্রায় এক, সেখানে আনন্দের খোরাক নেই বললেই চলে। ঘরে অকম্মা বর, গাদাখানেক এন্ডিগেন্ডি, ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই জুতে যায় হাড়ভাঙা খাটুনিতে, ইটভাটার মালিকও মজুরিতে দেদার ঠকায়, বাড়তি কিছু লোভের ইশারাও চলে অবিরাম। এক্ষুনি বাড়ি ঢোকামাত্র সংসারের ফাঁসকল চেপে বসবে গলায়, তবু যে এত পুলক আসে কোত্থেকে? অশিক্ষা, অজ্ঞতা কি দুঃখবোধকে ভোঁতা করে দেয়?

কিন্তু অহনার শিক্ষাদীক্ষা কি তীক্ষ্নতর বিষাদ সঞ্চার করে কোনও মুক্তি দিতে পেরেছে? অহর্নিশ জ্বালাপোড়া আর সেভাবে নেই হয়তো, কিন্তু আনন্দের জন্মদাতা কোষগুলো যে চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে, এতে তো কোনও সন্দেহ নেই? সুতরাং নিজেকে ওই সরল মেয়েগুলোর তুলনায় উচ্চতর কিছু ভাবাটা কি নেহাতই মনকে চোখ ঠারা নয়?

অহনার মোপেডকে ভারী সম্মান করে মেয়েগুলো। আরোহিণীকেও। রঙ্গ তামাশা থামিয়ে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দাঁড়িয়েছে। আবছা হাসি বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে দলটাকে পেরোল অহনা। বাহনের গতি সামান্য বাড়িয়েছে। শ'খানেক মিটারও এগোতে পারল না, থামতে হয়েছে অচিরেই। গোটা রাস্তা জুড়ে ইট বোঝাই লরি আসছে। পাশ দেওয়ার জায়গা নেই, মোপেড টেনে নামাতে হল প্রান্তে। লরি চলে যেতেই চতুর্দিকে ধুলোর ঝড়। অহনাও ধুলোয় মাখামাখি।

বিরক্ত মুখে হেলমেট খুলল অহনা। আঁটোসাঁটো জড়ানো দোপাট্টার খুঁটে মুছল ঘাড়গলা। কামিজ থেকে ঝাড়ছে ধুলোর আস্তরণ।

তখনই সামনে এক সাইকেল। চেনা মুখ, বিশ্বজিৎ। আলাইপুরেই বাড়ি, বছর কুড়ি-বাইশ বয়স, রানাঘাট কলেজে বি এ পড়ছে। কথাবার্তায় উদ্ধত নয়, বরং বেশ নম্রই। সম্ভবত রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব নেই বলেই সভ্যতা ভব্যতার সাধারণ বোধগুলো হারায়নি এখনও।

সিট থেকে নামল বিশ্বজিৎ। ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে বলল, "লরির জ্বালায় রাস্তা চলা দায়।"

"কী আর করা।" অহনা হালকা ভাবে বলল, "তোমরা তো রাস্তাঘাট সারাবে না।"

"আমরা কি রাস্তা সারানোর মালিক, দিদি? যারা কাজকর্ম করায়, তারা নিজেদের সময় মতো লোক লাগাবে। ক'টা দিন যাক... এই বর্ষার মুখে আবার ইট ফেলবে।"

"যাতে বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়?"

"সবই তো বোঝেন দিদি। ধুয়ে না গেলে সামনের বছর ঠিকাদার বরাত পাবে কোত্থেকে?"

আর সে বরাত না পেলে পার্টির দাদাদের পেট ভরাবে কে? বলতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করল অহনা। বিশ্বজিৎ ছেলে যেমনই হোক, তার সামনে বেশি প্রগল্‌ভ হওয়া কি অহনার সাজে? বিশেষত রাজনীতির লোকজনদের সম্পর্কে মন্তব্য না করাই ভাল। অনেক কাল পরে সরকার বদলেছে, কিন্তু যারা এসেছে তারাও আগের দাদাদের থেকে আলাদা কিছু নয়। আগে একাধিকবার তার সঙ্গে স্থানীয় নেতার আমচা-চামচাদের ঠোকাঠুকি লাগার উপক্রম হয়েছে, কোনওভাবে সামাল দিয়েছে অহনা, নতুন করে ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ার তার কোনও বাসনা নেই। নিজের কাজটুকু তার গড়িয়ে গড়িয়ে চলুক, তা হলেই যথেষ্ট।

অহনা আলগা ভাবে বলল, "তোমার পরীক্ষা চুকল?"

"এই তো সবে...।" বিশ্বজিৎ সাইকেল টেনে রাস্তার পাশটিতে এল। খানিক সংকুচিত স্বরে বলল, "আপনার সঙ্গে একটা দরকার ছিল দিদি। বাবাও হয়তো আপনাকে বলবে...।"

অহনার ভুরুতে প্রশ্নচিহ্ন।

আমতা আমতা করে বিশ্বজিৎ বলল, “শুনেছেন নিশ্চয়ই মেজদি শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসেছে?”

আশাবরীতে কাজ করতে আসা মেয়েদের কল্যাণে আলাইপুরের কোনও গৃহেরই ভালমন্দ সমাচার অহনার অবিদিত থাকে না। কাল না পরশু কবে যেন পুব পাড়ার নীতা বলছিল খবরটা। অভ্যাস মতোই সেভাবে কানে তোলেনি অহনা। আজও খুব একটা উত্সাহ দেখাল না। দায়সারা ভঙ্গিতে বলল, “তাই বুঝি। কেন?”

“সে অনেক ব্যাপার দিদি। বিয়ের পর থেকেই টাকার জন্য মেজদির ওপর খুব চাপ দিচ্ছিল জামাইবাবু। বাবা দফায় দফায় কিছু জুগিয়েছে। এখন জামাইবাবু টু হুইলারের ডিলারশিপ নেবে বলে খেপেছে। বেশ কয়েক লাখ টাকার ধাক্কা। ওই খাঁই মেটানো কি আমার বাবার পক্ষে সম্ভব, বলুন? মেজদির ওপর তাই ওরা ভীষণ টর্চার শুরু করেছিল। বাধ্য হয়ে মেজদি...”

“তোমার মেজদির তো দুটো বাচ্চা, তাই না?”

“দুটোই মেয়ে। ওই কারণেই তো শাশুড়িটা মেজদির ওপর আরও চটা। ছোটটা এবার ক্লাস ফোরে উঠেছে, আর বড়টা নাইন। তাদের পড়াশুনোরও তো এখন দফারফা হওয়ার জোগাড়। কীভাবে ওদের মানুষ করবে সেই চিন্তাতেই তো মেজদির পাগল পাগল দশা।”

“শ্বশুরবাড়ি আর ফিরবে না?”

“এবার গেলে মেজদিকে ওরা মেরে ফেলবে। যা একখানা চশমখোর ফ্যামিলি, বাব্বাহ্। মা বাপ ছেলে সকলেই টাকার পিশাচ।”

বিয়ে দেওয়ার আগে কি কিছুই টের পাওনি? প্রশ্নটা জিভে এলেও গিলে নিল অহনা। নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়ে যাচ্ছে ভেবেই তো বাবা মা সর্বস্ব পণ করে বিয়ে দেয় মেয়ের। পরে কী ঘটবে, মেয়ের শ্বশুরবাড়ি কী রূপ দেখাবে, তা কি অগ্রিম অনুমান করা সম্ভব? উচ্চশিক্ষিত, সজ্জন বলে পরিচিত

পরিবারের মানুষরাও একেক সময়ে যা ভেলকি দেখান! আপাদমস্তক সভ্য মানুষটাই কেমন যেন আজব একখানা মূর্তিতে পরিণত হয় তখন। অচেনা সেই রূপ তো এখনও অহনার দুঃস্বপ্ন।

ফুসফুসে অনেকটা বাতাস টেনে অহনা বলল, "বুঝলাম। তা আমাকে কী করতে হবে?"

"আপনার তো অনেক চেনাজানা। দেখুন না মেজদিটার যদি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন।"

"কীভাবে?"

"বাবা বলছিল, আশপাশের কয়েকটা ব্লকে নাকি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নেওয়া হবে। মেজদি তো হায়ার সেকেন্ডারি পাশ, যদি কোনওভাবে মেজদিকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়..."

অহনা অস্বস্তিবোধ করল। টুকুন থেমে থেকে কেজো সুরে বলল, "দ্যাখো বিশ্বজিৎ, এইসব চাকরি কীভাবে হয় তুমি ভাল মতোই জানো। এও জানো, আমি কোনও দলবাজিতে নেই। সুতরাং আমার রিকোয়েস্ট কেউ রাখবেও না, আমিও কাউকে বলে মুখ নষ্ট করতে পারব না।"

চুপ হয়ে একটু ভাবল বিশ্বজিৎ। তারপর বলল, "আপনার আশাবরীতেও তো অনেক মেয়ে কাজ করে দিদি। যদি সেখানেও কিছু হয়..."

"তুমি তো দেখেছ, আমরা কী তৈরি করি। সোলার টর্চ, এমার্জেন্সি লাইট... এসব বানানো তো জানতে হয়, শিখতে হয়...। তা ছাড়া এক্ষুনি নতুন মেয়ে নেওয়ার মতো আমার অবস্থাও নেই। বুঝতেই তো পারো, আশাবরী আর পাঁচটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো নয়... আমাদের রিসোর্স লিমিটেড..."

বলতে বলতে অহনা থমকাল। বেশ টের পেল ভাষণটা বৃথা যাচ্ছে, মোটেই প্রীত হচ্ছে না ছেলেটা। পাছে ফের ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করে, অহনা গলা নামিয়ে বলল, "ঠিক আছে, তোমার মেজদিকে পাঠিয়ে দিয়ো। দেখি কী করতে পারি।"

বিশ্বজিতের মুখখানা বেশ উজ্জ্বল দেখাল, "কবে যেতে বলব?"

"যেদিন খুশি। তবে সকালে নয়, দুপুরের দিকে।"

“থ্যাঙ্ক ইউ দিদি। মেজদিটার একটা হিল্লে হলে মা বাবার একটু টেনশন কমে।” বিশ্বজিৎ সাইকেলের প্যাডেলে পা ছোঁয়াল।

হঠাৎ কী মনে পড়ে গেছে বিশ্বজিতের। বলে উঠল, “ও হ্যাঁ দিদি, আপনার বাড়িতে কে যেন এসেছে।”

“শুনছিলাম বটে।” অহনার ভুরুতে ভাঁজ, “কে বলো তো?”

“চিনি না দিদি। আগে কখনও দেখিনি। জিন্‌স টি-শার্ট পরা, মাথাভরতি কোঁকড়া চুল, পায়ে স্নিকার। বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে ঘাট অবধি চলে গিয়েছিল। আমিই ডেকে দেখিয়ে দিলাম।”

পলকের জন্য অহনার মনে হল, জয় নয় তো? সুগতর মামাতো ভাই? মাঝে একদিন দেখা হয়েছিল জয়ের সঙ্গে। মাল ডেলিভারি দিতে গিয়ে। কলকাতার বাগড়ি মার্কেটে। অহনা এখন থাকে কোথায়, কী করছে, জিজ্ঞেস করছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। যা খ্যাপা ধরনের ছেলে, দুম করে চলেও আসতে পারে। কিন্তু জয়ের চুল তো কোঁকড়া নয়। তবে? যাক গে যাক, পৌঁছে বোঝা যাবে।

ছায়া ছায়া অন্ধকারে বাকি পথটুকু পেরোল অহনা। বেঁটে পাঁচিল ঘেরা কম্পাউন্ডটার কাছে এসে মোপেড থামাতেই কানে এল এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর। গলাটা বেশ গমগমে, বাড়ি কাঁপিয়ে হেসেও উঠল আচমকা।

বিস্ময় বাড়ছিল অহনার। বিস্ময়বোধ ভোঁতা হয়ে গেছে বহুকাল, তবুও।

.

॥ ২ ॥

জমিটা নেহাত ছোট নয়, প্রায় বিঘা দেড়েক। বেশির ভাগটাই অবশ্য ফাঁকা পড়ে। নির্মাণ বলতে আছে শুধু জমির মাঝ বরাবর একখানা সাদামাটা একতলা বসতবাড়ি, আর চৌহদ্দির নিশান বেঁটে পাঁচিলখানা ঘেঁষে আশাবরীর অর্ধসমাপ্ত কর্মশালা। বাড়ির সামনে অল্প একটুখানি বাগান মতো করেছে শেফালি। ওই বাগান চিরে সারিবদ্ধ কংক্রিটের স্ল্যাব, লোহার গেট থেকে সেই গ্রিলঘেরা বারান্দা পর্যন্ত।

অহনা প্রায় নিঃশব্দে গেট খুলে ঢুকল কম্পাউন্ডে। বেল-কামিনীর সুবাসে বাগান এখন ম ম। মোপেড ঠেলে বারান্দার কাছে পৌঁছোতেই আবার সেই অচেনা স্বর। কী যেন একটা বলল, অমনি বেশ আওয়াজ করে হেসে উঠল শেফালি। মা এমনধারা হাসে না তো বড় একটা। মা'র বাপের বাড়ির কেউ এল নাকি? কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয়?

ব্যাগ থেকে চাবি বার করে অহনা নিজেই হাত গলিয়ে খুলে নিল গ্রিলবারান্দার তালা। সামান্য শব্দ পেয়েই শেফালি বেরিয়ে এসেছে। উচ্ছ্বাসভরা গলায় বলে উঠল, "এত দেরি করলি যে বড়! দেখবি আয়, তোর জন্য কী সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে?"

ভ্রূকুঞ্চনে কৌতূহল ঢাকল অহনা। মোপেড বারান্দায় তুলে ইচ্ছে করে ধীরেসুস্থে পা রাখল অন্দরে। বেতের সোফায় উপবিষ্ট এক তরুণ। মুখখানা চেনাচেনা লাগে যেন? কোথায় দেখেছে... কোথায়...?

উঠে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা। মিটিমিটি হাসছে, "কী মনে পড়ছে না তো?"

ঈষৎ অপ্রতিভ স্বরে অহনা বলল, "হ্যাঁ,... না... মানে ঠিক প্লেস করতে..."

"আরে, ও তো আমাদের অর্ঘ্য।" শেফালির আর তর সইল না, লঘু ধমকের সুরে বলল, "দ্যাখ ভাল করে, আসানসোলের অরবিন্দবাবুর ছেলে..."

মানে পূজার ভাই! ধাতস্থ হতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল অহনার।

চমকিত স্বরে বলল, "তুমি এত বড় হয়ে গেছ?"

"বড় কী বলছ, বুড়ো হয়ে গেছি।" অর্ঘ্য হা হা হেসে উঠল। কোঁকড়া চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, "খুঁজলে দু'-চার পিস পক্ককেশও মিলবে।"

"যাহ, তুই তো পুচকে।" রশিবাঁধা মন ছাপিয়ে হঠাৎ পুরনো দিনের সুবাস উপচে এল অহনার গলায়, "আমার চেয়ে তুই ঢের ছোট। কম করে সাত-আট বছর।"

“উঁহু, মেরেকেটে ছয়। অবশ্য দিদি আর তুমি যদি সেম এজ হও।” অর্ঘ্য গলা খাঁকারি দিয়ে চোখ ঘোরাল, “তোমরা একই ক্লাসে পড়তে নয় কি?”

শেফালি গদগদ স্বরে বলল, “তোর চেহারা কিন্তু একদম পালটে গেছে রে। কোথায় সেই ফোলা ফোলা গাল সাইকেল নিয়ে আসানসোলময় টো টো করে বেড়ানো বিচ্ছু ছেলে, আর কোথায় এই মুশকো জোয়ান! পরিচয় দেওয়ার পরেও তো ওকে দরজা খুলছিলাম না। ওর হাসিটা দেখে তবে মনে পড়ল।”

অর্ঘ্যকে দেখতে দেখতে অহনা বলল, “হ্যাঁ, ওর হাসিটা এখনও একই রকম আছে।”

“ভাগ্যিস আছে। নইলে তো আমার কপালে আজ দুঃখ ছিল। এখানে অনুদির যা ফিল্ড দেখলাম... মাসি একবার চেঁচালে আমি আর জ্যান্ত থাকতাম কিনা সন্দেহ।”

“ফালতু বকিস না।” অহনা ব্যাগ রেখে সোফায় বসল। এককালের ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর ভাইকে দেখে কোথায় সে উচ্ছলই থাকবে, কিংবা, নিদেনপক্ষে স্মৃতিমেদুর, তার বদলে কেন যে বুকে ফের শুঁয়োপোকা নড়াচড়ার অনুভূতি? কেন যে পুরনো পরিচিতদের সান্নিধ্যে স্বস্তি পায় না অহনা? তবুও স্বরে একটু হালকা ভাব রাখল, “প্রভাব প্রতিপত্তি কিস্যু নেই রে ভাই। এ তল্লাটে বছর কয়েক আছি, একটা সমিতি মতো চালাই, সেই সুবাদে দু’-পাঁচজন চেনে, এই যা।”

“বটে? আমার কিন্তু তা মনে হল না। যেভাবে কোলে করে এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল!”

অর্ঘ্যর বলার ঢঙে হেসে ফেলল অহনা। আজকাল স্বতঃস্ফূর্ত হাসি তার আসে না বড় একটা, তবুও। ঠোঁট টিপে বলল, “তা আমার হদিশ পেলি কোত্থেকে?”

“স্বেচ্ছা নির্বাসনে আছ নাকি? কেউ তোমার ঠিকানা জানে না?”

“তা নয়। কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে আছি, কারও সঙ্গেই তো তেমন একটা যোগাযোগ নেই...”

অহনা একটু থেমে থেকে বলল, “কে? কে দিল আমার অ্যাড্রেস?”

একটুক্ষণ অহনার দিকে তাকিয়ে রইল অর্ঘ্য, যেন পড়তে চাইছে দিদির বান্ধবীটিকে। তারপর সহজ সুরেই বলল, “সে এক গল্প। পরশু বিকেলে কলেজ স্ট্রিটের এক বুকস্টলে পত্রিকা ঘাঁটছি, হঠাৎ দোকানের ছেলেটার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের জোর তর্ক বাধল। ভদ্রলোক একটা ম্যাগাজিন কিনেছিলেন, মাঝের কয়েকটা পাতা মিসিং, উনি বদলাতে চাইছেন, ছেলেটা রাজি নয়। ভাল করে লক্ষ করতেই দেখি, আরে এ যে লাল্টুদা।”

“ও, তাই বল। দাদার কাছ থেকে...”

“লাল্টুদাও কিন্তু আমায় প্রথমটা চিনতে পারেনি।” অহনার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে অর্ঘ্য বলল, “তবে পরিচয় পেয়ে খুব খুশি। চা-টা খাওয়াল। কথায় কথায় তখনই তো বলল, তুমি এখন খুব হাই-ফাই হয়ে গেছ, বিশাল কর্মকাণ্ড চালাচ্ছ...। শুনে ভাবলাম, যাই, একটু সরেজমিন করে আসি।” তড়বড় করে কথা বলতে বলতে অর্ঘ্য থামল ক্ষণিক। চোখে রহস্যের ভাব ফুটিয়ে বলল, “আমার অবশ্য অন্য ইন্টারেস্টও আছে।”

“কী রে?”

“বলব, বলব। তাড়া কীসের। তুমি নিশ্চয়ই এক্ষুনি আমায় ভাগিয়ে দিচ্ছ না? শুধু চা খেয়েছি, এবার বোধহয় একটু জলখাবারও পাব...। তুমি ততক্ষণে ফ্রেশটেশ হয়ে নাও।”

অহনা অপ্রস্তুত মুখে ঘুরে তাকাল। শেফালিকে বলল, “ওকে এখনও কিছু খাওয়াওনি?”

“আহা, এই তো খানিক আগে এল। চায়ের সঙ্গে ওমলেট দিচ্ছিলাম, ও নিজেই বারণ করল। বলল, তুই ফিরলে একসঙ্গে খাবে।”

“এবার তা হলে বডিটা নাড়াও।”

“লুচি ভাজব? কৃষ্ণা আছে এখনও, মেখে বেলে দেবে।”

“স্ট্রেঞ্জ, জিজ্ঞেস করছ?” ভেতরের শুঁয়োপোকাটা আবার নাড়াচড়া করছে, তাকে দাবিয়ে স্বরে স্নেহশীলা দিদি দিদি ভাব ফোটাল অহনা, “ছেলেটা কতদূর থেকে তেতেপুড়ে এসেছে... এদিকে তুমি এখনও হাত গুটিয়ে...”

“যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি।” শেফালি উঠে দাঁড়াল, “তা তুমিও খাবে নিশ্চয়?”

“রোজ তোমায় এক কথা বলতে হবে? এই গরমে সন্ধেবেলায় স্নান না করে আমি কিছু মুখে তুলি?” অভ্যাসমতোই স্বর রুঢ় হয়েছিল অহনার, সামলে নিয়ে বলল, “আমার শুধু চা।”

“যা তোমার মর্জি।”

পালটা ঝাঁঝ ছুড়ে দিয়ে শেফালি রান্নাঘরে। অহনা আমল দিল না, হেলান দিয়ে বসেছে। মেঝেয় অর্ঘ্যর রুকস্যাক, সেদিকে পলক দৃষ্টি ফেলে বলল, “পূজা এখন কী করছে রে?”

“গড়পড়তা মেয়েরা যা করে। চুটিয়ে সংসার। পিটিয়ে পিটিয়ে ছেলেটাকে গাধা বানাচ্ছে।”

“ওর জামশেদপুরে বিয়ে হয়েছিল না?”

“হ্যাঁ।”

“এখনও কি সেখানেই?”

“ছিল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত।” অর্ঘ্য গলা ঝাড়ল, “লাস্ট ডিসেম্বর থেকে সিঙ্গাপুরে।”

“তাই বুঝি?”

“হ্যাঁ গো, ওর বর একটা ভাল অফার পেল...।” অর্ঘ্য একটু থমকে বলল, “বাবা তো দিদির বিয়ের চিঠি পাঠিয়েছিল, তোমরা কেউ এলেই না।”

সে তো আমার বিয়েতেও তোরা... বলতে গিয়েও ঢোক গিলল অহনা। অপ্রিয় প্রসঙ্গটা নাড়াঘাঁটা না করাই তো ভাল। আলগোছে বলল, “হয়ে ওঠেনি রে। তা মাসি-মেসোর কী খবর? আছেন কেমন?”

“এই বয়সে যেমন থাকে।” অর্ঘ্য কাঁধ ঝাঁকাল, “ফুটবল খেলা বা নাচার মতো ফিটও নয়, আবার শয্যাশায়ীও নয়। বাত, প্রেশার, থাইরয়েড নিয়ে ভালই আছে দুটিতে।”

“আমার বাবা তো চলেই গেল।” অহনা সামান্য আনমনা, “কীই বা এমন বয়স হয়েছিল? মাত্র চৌষট্টি। কোনও অসুখ নেই বিসুখ নেই, হঠাৎ কোত্থেকে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। এবং এক ধাক্কাতেই শেষ।”

“হ্যাঁ লাল্টুদা বলছিল।... তোমরা নাকি ট্রিটমেন্টেরও সময় পাওনি।”

অহনা সামান্য কুঁকড়ে গেল। আর কী কী গল্প করেছে দাদা? অহনা কেন মাকে নিয়ে আলাইপুর চলে এল জানিয়েছে কি? আশা করা যায় অহনা-সুগতর বৃত্তান্তও ঘটা করে শোনায়নি? অবশ্য জানলেই বা কী ক্ষতি, না জানলেই বা অহনার কী এমন মোক্ষপ্রাপ্তি? চামড়া অনেক পুরু হয়ে গেছে অহনার, লোকলজ্জা আর তেমন গায়ে বেঁধে না। একমাত্র সমবেদনার ভারী ভারী নিশ্বাসই যা গোল পাকায়, বড্ড তেতো করে দেয় মেজাজটা।

কথা ঘোরাতে চাইল অহনা। সোজা হয়ে বসে বলল, “যাক গে, এবার তোর কথা বল? কী করছিস এখন?”

“আমি?” অর্ঘ্য ঘাড় চুলকোচ্ছে, “ধরে নাও, এক ধরনের ভ্যারেন্ডা ভাজছি।”

“মানে?”

“ইকনমিক্সে মাস্টার ডিগ্রি করেছিলাম। তারপর একটা চাকরিও জুটেছিল। মাস্টারি। এখন সব ছেড়েছুড়ে একটা প্রোজেক্ট করছি।”

“কী প্রোজেক্ট?”

“ওই একটা...রুরাল ভারতবর্ষ নিয়ে...।”

“তাই বল। কোনও ফেলোশিপ পেয়েছিলি বুঝি?”

“ওই আর কী। মিলে গেছে কপালজোরে।”

“কোন ইউনিভার্সিটির ফেলোশিপ? কলকাতা? যাদবপুর?”

“না না, একটা বিদেশি অর্গানাইজেশন... নানান ধরনের গ্লোবাল স্ট্যাটিসটিক্স তৈরি করে ওরা... গবেষণার কাজে লাগে তো।”

“তা কদ্দিনের প্রোজেক্ট?”

“ধরা বাঁধা কোনও টাইম লিমিট নেই। তবু মোটামুটি দু’-আড়াই বছর।”

“তারপর কী করবি?”

“অত ভাবাভাবি আমার আসে না অণুদি। কে বলতে পারে, তখন হয়তো আমি রইলামই না।”

“কেন? কোথাও যাওয়ার প্ল্যান আছে নাকি?”

“আরে না।...তবে বলা কি যায়, হয়তো দুম করে অক্কাই পেলাম।”

“ও কী ধরনের অলুক্ষুনে কথা।” দরজা থেকেই চেঁচিয়ে উঠল শেফালি। হাতে লুচি-তরকারির থালা, চোখে কঠোর ভর্ত্সনা। গোল সেন্টার টেবিলে প্লেট রাখতে রাখতে বলল, “বাবা-মা বেঁচে থাকতে এমন কথা উচ্চারণ করে কেউ?”

“আরে রেগে যাচ্ছ কেন?” অর্ঘ্য হাসছে, “আমি জাস্ট একটা কথার কথা বলছিলাম।”

“সব কথা মুখে আনতে নেই রে।” কৃষ্ণা চা এনেছে, মেয়েকে কাপ বাড়িয়ে দিয়ে শেফালি অর্ঘ্যকে ফের বলল, “মুখের ভাল ভাল কথা কক্ষনও ফলে না রে ছেলে, কিন্তু খারাপ কথাই আচমকা সত্যি হয়ে যায়।”

অহনার মুখমণ্ডল পলকে ম্লান। মা কেন যে বলল কথাটা বুঝতে অসুবিধে নেই। মাঝেসাঝেই বলে কিনা। সুগতকে বিয়ে করার জন্য যখন খেপে উঠেছিল অহনা, বাবার আপত্তি ছিল খুব। ভয় দেখিয়েছিল, তাড়িয়ে দেবে মেয়েকে। সেদিন জেদাজেদির লড়াইয়ে মেয়েরই পক্ষ নিয়েছিল শেফালি। মা-মেয়ের সাঁড়াশি আক্রমণে হার মানতে হয়েছিল বাবাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে বলেও ছিল, ‘‘এত কাণ্ড

করে বিয়ে করছিস, শেষমেশ টিকবে তো?” বাবা হয়তো সুগতর আসল রূপটা আন্দাজ করতে পেরেছিল, কিংবা অনুমান করেছিল মেয়ে-জামাইয়ের স্বভাবের অমিলটা ক্রমশ প্রকট হয়ে একদিন না একদিন চুরমার হয়ে যাবে সম্পর্কটা।

মা কিন্তু এখনও, এত বছর পরেও, বাবার সেই মুখের কথাটাকেই ধরে বসে আছে। যেন ওই বাক্যটি উচ্চারণ না করলে আজও সুখে শান্তিতে সুগতর ঘর করত অহনা। এমন একটা হাস্যকর ধারণায় অহনা একসময় মজা পেত, ইদানীং বিরক্তিবোধ করে। একটা জ্বালাও টের পায় যেন। মনে হয়, ঘর ভাঙার জন্য পরোক্ষে তার দিকেও আঙুল তুলছে মা।

ভার মুখে চায়ে চুমুক দিল অহনা। মেয়ের ভাবান্তর নজরে পড়েনি শেফালির, আবার ফিরে গেছে ঘরোয়া আলাপচারিতায়। সহজ স্বরেই বলল, “তা তোর বাবা মা কি এখনও আসানসোলেই?”

“কোথায় আর যাবে?” আলুচচ্চড়িতে আস্ত লুচি পাকিয়ে মুখে পুরল অর্ঘ্য। চিবোতে চিবোতে বলল, “রিটায়ারমেন্টের মুখে মুখে চেলিয়াডাঙায় একটা ফ্ল্যাট কিনেছিল। ব্যস, ওখানেই থিতু।”

“ফ্ল্যাট কেন? ওঁর না বাড়ি করার খুব শখ ছিল?”

“হয়ে উঠল না মাসি। দিদির বিয়েতে বড্ড বেশি খরচা করেছিল বাবা। পিএফ থেকেও অনেক টাকা লোন তুলেছিল। ফলে যা হয়, প্রপার আসানসোলে জমিই কিনতে পারল না। ওদিকে মা তো কিছুতেই টাউন ছেড়ে নড়বে না। অগত্যা কোনওক্রমে একটা ছোটখাটো ফ্ল্যাট। সাড়ে সাতশো স্কোয়ার ফিটের মতো।”

“বুড়ো বয়সে ছোট আস্তানাই ভাল। এই তো দ্যাখ না, এত বড় একটা জায়গা সামলাতে আমার কী হিমসিম দশা! যেদিকে দুটো দিন না তাকাব, অমনি সেদিকে আগাছা-টাগাছা হয়ে... পুরো জঙ্গলের চেহারা নেয়...। সব দায় আমার, অণু, তো ভুলেও কোনও দিকে তাকায় না...।”

“কাঁদুনি গাওয়ার অভ্যেসটা এবার ছাড়ো তো।” অহনা আচমকা ঝেঁঝে উঠল, “কে তোমায় দায় নিতে মাথার দিব্যি দিয়েছে, অ্যাঁ?”

“মানুষের মাঝে থাকলে বাড়িঘরকে একটু ভদ্রস্থ রাখতে হয়।”

“তো রাখো না, ঘ্যানঘ্যান করছ কেন? আমি কি শুয়ে বসে থাকি সারাদিন? ঘরদোরের কাজকর্ম করলে তো তোমারই ভাল, এক্ষুনি অথর্ব হয়ে পড়বে না।” অহনা ভুরু নাচাল, “কী রে অর্ঘ্য, ভুল বলেছি।”

“নেহি। বিলকুল সহি বাত কহি আপ নে।” অর্ঘ্যর গলায় মজার সুর, “কিন্তু একটা কথা বলো তো। তোমরা এখানে জমিবাড়ি কিনতে গেলে কেন? অণুদিই কি পরামর্শ দিয়েছিল মেসোকে?”

“আরে না না।” আবার শেফালির গলাই বেজে উঠল, “এটা তো পাকেচক্রে কেনা। সত্যি বলতে কী, আমরা তখন বেহালার ফ্ল্যাটের পজেশন পেয়ে গেছি। হঠাৎ একদিন অণুর বাবা তার এক সাব-অর্ডিনেটের কাছে খবর পেল, এখানে জলের দরে বাড়িসুদ্ধু জমি বিক্রি আছে। দেখতে এসে জায়গাটা তার এতই পছন্দ হয়ে গেল, ফিরেই বলে, নগরবাস তো অনেক দিন হল, এবার বাকি জীবনটা প্রকৃতির মাঝে কাটাব। সাড়ে তিন লাখ টাকায় এতটা জমিসুদ্ধু বাড়ি... তাও খুব বেশি দিন আগে নয়, মাত্র দশ বছর... ভাবতে পারিস!”

“হুম, খুবই সস্তা।... তা মেসোমশাই এখানে এসে থেকেছেন?”

“কই আর।...প্রথম প্রথম অবশ্য খুব উত্সাহ ছিল। ঘরদোর সারাল, রং করাল, শনি-রোববার ছুটি ছাটায় চলেও আসত। লাল্টু-ঝুমাও তখন এসে থেকে গেছে দু’-চার বার। দেড়-দু’বছর যেতে না যেতেই সকলের এনার্জি খতম। এমনকী তোর মেসোমশাইয়েরও। বলে, ওরে বাবা বড্ড দূর। শেয়ালদা থেকে ট্রেনে লাগে পাক্কা দু’ঘণ্টা, তার পরেও চার-পাঁচ কিলোমিটার ঠেঙিয়ে তবে এই আলাইপুর গ্রাম। তা শখ করতে এত খাটুনি কি শহুরে বাবুদের পোষায়? ব্যস, যে লোকটা পাহারায় থাকত, তার হল পোয়াবারো। লোকাল পিকনিক পার্টিদের ভাড়া দিয়ে শীতের মরশুমে দেদার পয়সা

কামাত। অণুর বাবা আর দাদা তো বেচে দেওয়ার কথাও ভাবছিল তখন।” শেফালি ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল, “তা সেও তো আর হল না, তার আগেই উনি পরপারে।”

“মেসোমশাইয়ের কেনাটা বৃথা যায়নি, এটা কিন্তু একটা প্লাস পয়েন্ট। জায়গাটা ছিল বলেই না অণুদি এখানে একটা কাজ করতে পারছে।”

“হুঁহ, তাতে যে কার কী মোক্ষ লাভ হচ্ছে, সে তোমার অণুদিই জানে। এসব কি মেয়েমানুষের কাজ?”

“কী বলছ মাসি? আজকাল মেয়েদের কাজ ছেলেদের কাজ বলে আলাদা কিছু আছে নাকি?”

“খুব আছে। সে তোমরা মানো, ছাই না মানো। তফাত যদি নাই থাকবে, বিধাতা তা হলে দু’ কিসিমের জীব বানালেন কেন?”

মোক্ষম যুক্তি! বাবাও এই কথাটাই বলত না কথায় কথায়! সৃষ্টি টিকে থাকার নিছক জৈবিক নিয়মটা কি সুচতুর ভাবেই না ব্যবহার হচ্ছে, হয়েই চলেছে। আজও। কী আশ্চর্য, মেয়েরাও কথাটা অন্ধের মতোই বিশ্বাস করে। হয়তো ছেলেদের চেয়েও বেশি। নইলে তার আর সুগতর বাদ-বিবাদের সময় মা কি চোখ-কান বুজে সুগতর পক্ষ নিতে পারত?

স্মৃতির ঢেউয়ে দোলা উঠতে দিল না অহনা। মা যেভাবে এগোচ্ছে, থামানো দরকার। নয়তো ঢুকে পড়বে অহনার অপছন্দের সড়কে।

অহনা তাড়াতাড়ি বলল, “মা এখনও ঠাকুমা দিদিমাদের যুগেই পড়ে আছে। দুনিয়া কোথায় পৌঁছে গেছে মা তার খবরই রাখে না।”

শেফালি অপ্রসন্ন গলায় বলল, “অ। আমি বুঝি নিউজ দেখি না?”

“ওফ্, কী কথার কী যে মানে করো? তেষট্টিতেই বাহাত্তরে ধরে গেল!”

অর্ঘ্য লুচি শেষ করে চুমুক দিচ্ছে চায়ে। দাড়িগোঁফহীন চৌকো মুখখানায় পলকা হাসির আভাস। চোখ ঘুরছে ঘরের এদিক সেদিক। কোণের টেবিলে রাখা টিভিটা দেখিয়ে বলল, “ওটা চলে নিশ্চয়ই?”

“খুব চলে।”

“কেব্‌ল কানেকশনও তো আছে দেখছি? তা শেফালিমাসির টিভির নেশা নেই?”

“ওরে বাবা, নেই আবার...! সাধে কি মগজে জং পড়েছে?” অহনা মুখ বেঁকাল, “অন্তত ছ’-ছ’খানা সিরিয়াল সিন টু সিন মুখস্ত। আজ তোর অনারে বন্ধ রেখেছে মা।”

“এহে, আমি তো তা হলে মাসির সন্ধেটা নষ্ট করে দিলাম।”

বুঝতেই যখন পারছ, এবার কেটে পড়ো না বাপু। স্নান করে শীতল হয়ে শান্তিতে একটু গড়াগড়ি খাই বিছানায়। মনে মনে বলল বটে অহনা, কিন্তু মুখে তো ভদ্রতা বজায় রাখতেই হয়। সভ্য হওয়ার জ্বালা কম! ঠোঁটের কোণে হাসি ধরে রেখে অহনাকে বলতেই হল, “আরে না। ঠিক সময় করে রিপিট টেলিকাস্ট দেখে নেবে মা। নয় তো কাল থেকেই অম্লশূল-পিত্তশুল-আর্থারাইটিস-স্পন্ডেলোসিস সমস্ত রোগ একসঙ্গে স্টার্ট করে যাবে না!”

“না রে অর্ঘ্য, আমার অত নেশা নেই। সময় কাটে না বলে দেখি একটু-আধটু।” উষ্মা নয়, সহজ স্বরেই বলল শেফালি, “আমাকেও তো কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে, ঠিক কিনা?”

অহনাকে তেরচা চোখে দেখে নিয়ে অর্ঘ্য ঘাড় নাড়ল, “সে তো বটেই।”

সায় পাওয়ামাত্র শেফালি খুশিখুশি মুখে বলল, “তোকে দেখে আমার আজ কী ভাল যে লাগছে।... তুই এখন আছিস কোথায়?”

“আমি?” একটু বিচিত্র ভঙ্গিতে তর্জনী তুলে নিজেকে দেখাল অর্ঘ্য। অল্প কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “কেন...। কলকাতাতেই আছি...।”

“কোনও আত্মীয়ের বাড়ি?”

“না না। একটু যেন অনাবশ্যক জোরে মাথা দোলাল অর্ঘ্য, পেয়িং গেস্ট। বউবাজারের দিকটায়।”

“তা হলে তো তোর ফেরার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আজ রাত্তিরটা এখানেই রয়ে যা। তোর মুখে একটু আসানসোলের লোকজনের গল্প শুনি।”

এই ভয়টাই তো এতক্ষণ পাচ্ছিল অহনা। মা’র এই এক বিচ্ছিরি অভ্যেস, কেউ এলেই তাকে থেকে যেতে বলবে। কিছুদিন আগেই তো মা’র আহ্লাদ পেয়ে বড়মামার ছেলে টানা এক সপ্তাহ গেঁড়ে বসে রইল। যখন তখন আশাবরীর অফিসে ঢুকে পড়ছে, উপদেশ বর্ষণ করছে মেয়েগুলোকে...। পছন্দ হয় না অহনার, একদম সহ্য হয় না। আত্মীয়স্বজন চেনাপরিচিতের গণ্ডি থেকে দূরে থাকবে বলেই না তার এই টিয়াডাঙায় বাস। আশ্চর্য, মা একবার ভেবেও দেখে না মেয়ের প্রাইভেসি বলেও তো একটা বস্তু আছে। তার এই পুরুষবর্জিত সংসারে সে একটু নিজস্ব ঢঙে খোলামেলাভাবে থাকে, সেখানে সারাক্ষণ একটা দামড়া ছেলে, হোক না সে ভাই, ঘাড়ের পাশে ঘুরঘুর করছে... অসহ্য।

শেফালিদেবীর যদি আলাইপুরে এতই নিঃসঙ্গ লাগে, ফিরে যাক না ছেলের সংসারে। উঁহু, তা তিনি করবেন না। কত ধানে কত চাল হয়, দাদা-বউদি সেখানে বুঝিয়ে দেবে না প্রতি পদে। এখানে এত অঢেল স্বাধীনতা, আছেও রানির হালে, তবু কিছুতেই মেয়ের সুবিধে-অসুবিধে বুঝবে না? যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাতৃদেবী এখানে এসেছিলেন, সে তো কবেই চুকেবুকে গেছে। অহনা দিব্যি নিজেকে রপ্ত করে নিয়েছে আলাইপুরে। তার আর কারওকে প্রয়োজন নেই। মাকেও না।

ক্ষোভ চেপে অহনা সতর্ক স্বরে বলল, “দুম করে এমন এক একটা রিকোয়েস্ট করো না লোককে? ছেলেটা আমাদের দেখতে কদ্দুর থেকে ছুটে এসেছে, অমনি তাকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছ?”

“কেন? এক রাত নয় পুরনো মাসির কাছে রয়েই গেল...”

“ও তো আর বাচ্চা নেই। এখানে ওর আনইজি লাগতে পারে...”

“আমার কোনও প্রবলেম নেই।” অর্ঘ্য হেলান দিয়েছে সোফায়, ঠোঁট উলটে বলল, “থেকে গেলেই হয়।”

আর কী বলার থাকতে পারে অহনার। নিভে যাওয়া মুখে উঠে গেল ঘরে। ব্যাগ ট্যাগ রেখে নাইটি কাঁধে বাথরুম যেতে গিয়েও থমকাল। পলক ভেবে হাউসকোটখানাও নিল সঙ্গে। প্রবল অপ্রসন্নতা দূর করতেই বুঝি জোরে চালিয়ে দিয়েছে শাওয়ার। এই ধারাস্নানটুকুই অহনার একমাত্র বিলাসিতা। অবশ্য পিছনে মেহনতও আছে। খুদে একটি জলাধার বানাতে হয়েছে মাটির নীচে, টিউবওয়েলে পাইপ লাগিয়ে সেটিকে ভরা হয় নিয়মিত, পরে টুলু পাম্প ছাদের ট্যাঙ্কে তুলে দেয় সেই জল। বাড়তি লাভ, শেফালির হাঁটুভাঁজ সমস্যার সমাধান, কমোড বসেছে বাথরুমে।

আজ জল বেশ গরম এখনও। শরীর জুড়োচ্ছে না, তবে রোমকূপগুলো খুলে যাচ্ছে যেন। দেহের চ্যাটচেটে ভাব কমছে আস্তে আস্তে। অর্ঘ্যকে কোথায় শুতে দেবে আজ? বাইরের ঘর বাদে তিনটে তো মোটে কামরা, তার মধ্যে ছোটটি তো জিনিসে জিনিসে ঠাসা। সমিতির মাল, অহনার বইপত্র, এ ছাড়া বাড়িতে যা যা বাতিল হয়, সবই তো ওখানে ডাঁই। বাবলা টাবলা এলে এই ব্যাপারটায় মাথা ঘামাতে হয় না, বাইরের ঘরের মেঝেয় তোশক পেতে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অর্ঘ্যকে তো ওইভাবে...। তুৎ, মা যে কী এক একটা ঝামেলা ডেকে আনে!

ছেলেটা এখানে এসেছেই বা কেন? বলল তো শুধু দেখা করতে নয়, অন্য উদ্দেশ্য আছে...। আশ্চর্য, যার সঙ্গে ষোলো-সতেরো বছর যোগাযোগ নেই, তাকে কোন দরকারে লাগতে পারে অর্ঘ্যর। গ্রাম নিয়ে কী পেপার করছে, তার জন্য ডাটা চাইবে? আবার তা হলে অফিস খুলে কম্পিউটার নিয়ে বসতে হবে এখন?

ছোকরা বোধহয় রাতটা থাকার ধান্ধা নিয়েই এসেছিল! ইচ্ছে করে দেরি করছিল, যাতে অহনারা চাপে পড়ে? বহুত মতলবি তো, ঠিক ফাঁদে ফেলল!

ধুস, ভাল্লাগে না। গোটা দিনটাই কেমন উলটোপালটা যাচ্ছে!

সকালে ঘুম থেকে উঠে অহনা কি নিজের মুখটাই প্রথমে দেখেছিল আজ? আয়নায়? হবে হয়তো!

.

॥ ৩ ॥

...পাহাড়ি এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে হাঁটছে এক সৈনিক। গায়ে জলপাই রং উর্দি। রাস্তার দু'ধারে হালকা হালকা জঙ্গল। যতই এগোচ্ছে সৈনিক, ঘন হচ্ছে অরণ্য। পথের দু'ধারের গাছগুলো যেন জ্যান্ত মানুষ, ড্যাবড্যাব চোখে দেখছে হেঁটে চলা সৈনিককে। হঠাৎ সৈনিক চমকে তাকাচ্ছে চারপাশে। অজস্র বুটের আওয়াজ শোনা যায়, অথচ কেউ কোথাও দৃশ্যমান নয়। আচমকা রাশি রাশি গুলি ধেয়ে এল ডান দিকের জঙ্গল থেকে। বাঁদিক থেকে পালটা গুলি ছুটে গেল ডাইনে। গাছেরা কাঁপছে ঠকঠক, কুঁইকুঁই একটা গোঙানিও ফুটে বেরোচ্ছে তাদের গা দিয়ে। সৈনিক হঠাৎ ছুটতে শুরু করল, ডান-বাঁ কোনও দিকে না তাকিয়ে দৌড়োচ্ছে প্রাণপণ। কোত্থেকে সামনে সাইরেনের শব্দ, পরক্ষণেই কান ফাটানো বিস্ফোরণ। সর্বাঙ্গে আগুন নিয়ে একটা সাদা গাড়ি লাফিয়ে উঠল শূন্যে। সাঁইসাঁই ঝোড়ো হাওয়ায় গাছেরা উথালপাতাল দুলছে, তাদের গোঙানি ক্রমশ বাড়ছে যেন। বাড়ছে বুটের ধ্বনি, গুলি, পালটা গুলি, আগুনে ঝলসে যাওয়া সাদা গাড়িটা ঢেকে যাচ্ছে ধোঁয়ায়। মানুষ পোড়া গন্ধে ভরে গেছে জঙ্গল, সৈনিক দৌড়োতে দৌড়োতেই দু'হাতে টিপে ধরেছে নাক। শ্বাস বন্ধ হয়ে এল সৈনিকের, মুখ থুবড়ে পড়ল রাস্তায়। একটা পাখি দূর থেকে ডেকে উঠল, সৈনিক মুখ তুলে দেখার চেষ্টা করল পাখিটাকে। সঙ্গে সঙ্গে জলপাই রং উর্দির মুখ চেপে ধরল কেউ। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাচ্ছে সৈনিক, মুক্তি পেতে চাইছে, পারছে না, ছটফট করছে...

অর্ঘ্য ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বিছানায়। কী বাজে স্বপ্ন! এখনও যেন শ্বাস আটকে আছে গলায়। ওই সাদা গাড়িটাই তো অ্যাম্বুলেন্স, মাইন বিস্ফোরণে যেটা উড়ে গেল? উফ্‌ফ ওই অ্যাম্বুলেন্সটা কি অর্ঘ্যর পিছু ছাড়বে না?

দু’চোখ রগড়ে দীর্ঘ স্বপ্নটা মনের আড়ালে সরাল অর্ঘ্য। অমনি পলকা ঝাঁকুনি। একটা অচেনা ঘরে নেয়ারের খাটিয়ায় পাতলা চাদরে উপবিষ্ট অর্ঘ্য এখন ঠিক কোথায়?

ছোট্ট একটা জানলা দিয়ে আলো ঢুকছে ঘরটায়। বইয়ের এলোমেলো স্তূপ, ভাঙা টেবিল, কম্পিউটারের মনিটর, গোছাখানেক ইলেকট্রিক তার, কী না রয়েছে ঘরটায়। কাশীপুরের ডেরাটা এমন বদলে গেল কী করে?

হ্যাঁ মনে পড়ে গেছে। এটা তো শেফালিমাসির বাড়ি। কাল রাতে এই ঘরটাতেই তো ঢুকিয়ে দিয়ে গেল অণুদি। হাবিজাবি জিনিসে ঠাসা বলে অণুদি খুব লজ্জা পাচ্ছিল। জানে না তো, অর্ঘ্যকে যেসব জায়গায় রাত কাটাতে হয়, তার তুলনায় এটা স্বর্গ।

নেয়ারের খাটিয়া ছেড়ে অর্ঘ্য জানলায় এল। সূর্য উঠে গেছে অনেকক্ষণ। সামনেটা বোধহয় দক্ষিণ। পাঁচিলের ওপারে ইটভাটায় ঝকমক করছে রোদ্দুর। বাড়িতে সাড়াশব্দ নেই কেন? এখনও কেউ ওঠেনি নাকি? মা মেয়ে জাগার আগে নদীর ধার থেকে একবার চক্কর মেরে এলে হয়। অর্ঘ্যর পরনে শর্টস, খালি গা। এই পোশাকেই অর্ঘ্য দিব্যি বেরিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু অহনা যদি কিছু মনে করে? আশাবরীর কর্ত্রীর অতিথি যেমন তেমন পোশাকে গাঁয়ে চরে বেড়ালে অহনা চৌধুরীর মানে লাগবে না তো? এবং এই মুহূর্তে অহনাকে চটানোর ঝুঁকি নিতে অর্ঘ্য রাজি নয়।

রুকস্যাকখানা খাটিয়ায় তুলল অর্ঘ্য। এখন এই রুকস্যাকই তার সংসার। চেন খুলে একটা টি-শার্ট বার করেছে। সঙ্গে কালো ট্র্যাকপ্যান্ট। দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম রাখল খাটিয়ায়। দাঁত মাজার ব্রাশখানাও। হাত ঢুকিয়ে পরখ করে নিল সব ঠিকঠাক আছে কিনা। সযত্নে বন্ধ করল চেন। ঠেলে পাঠিয়ে দিল খাটের নীচটায়।

প্যান্ট টি-শার্ট গলিয়ে সবে দরজা খুলে বেরিয়েছে, সামনে শেফালি।

কাল প্রচুর বকবক করেছে মহিলা। আসানসোলের এমন এমন লোকদের কথা জিজ্ঞেস করছিল যাদের অর্ধেককে অর্ঘ্য চেনেই না। সে তো সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকে প্রায় ঘরছাড়া। তার ওপর গত দু'-তিন বছর সে আসানসোলের ত্রিসীমানা মাড়ায়নি...। এমত পরিস্থিতিতে কাঁহাতক মহিলার সঙ্গে সংগত করা যায়! ভাগ্যিস মেয়ে ধমকে-ধামকে চুপ করাচ্ছিল মাকে, তাই না খানিক রক্ষে পেয়েছে অর্ঘ্য। অবিরাম বানিয়ে বানিয়ে বলে যাওয়াটা কি কম ঝকমারি! এখন সাতসকালে কী জিজ্ঞেস করে বসবে কে জানে!

তবু প্রভাতের প্রথম সাক্ষাতে এক টুকরো অমলিন হাসি উপহার দিতেই হয় মহিলাকে। অর্ঘ্য চোয়াল নাড়িয়ে বলল, "গুড মর্নিং মাসি।"

"উঠে পড়েছিস? রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?"

"ফার্স্ট ক্লাস।"

"ইঁদুরে কোনও উৎপাত করেনি?"

"আছে বুঝি ইঁদুর? টের পাইনি। একঘুমে রাত কাবার হয়ে গেল কিনা।"

"খুব ভাল। চা খাবি তো? মুখ ধুয়ে নে, জল বসাচ্ছি।"

"ভাবছিলাম...গ্রামটা একটু ঘুরে আসি..."

"চা খেয়ে বেরো। তোর অণুদিও চায়ের জন্য ওয়েট করছে।"

ব্যস, আটকে গেল অর্ঘ্য। গুটিগুটি পায়ে এল বসার ঘরে। দেখল অহনা ম্যাগাজিন গোছের কী যেন একটা পড়ছে মন দিয়ে।

অর্ঘ্য গলা ঝাড়ল, "সুপ্রভাত অণুদি।"

দৃষ্টি ওঠাল অহনা। সামান্য নোয়াল মাথা। মৃদু গলাতেই জিজ্ঞেস করল, "তুই লাঞ্চ করে যাবি তো?"

সরাসরি এমন একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না অর্ঘ্য। অণুদির প্রশ্ন করার ভঙ্গিটা যেন কেমন কেমন। রাত্রেই ভাবে-আচরণে মনে হচ্ছিল, তার থাকাটা যেন অণুদির পছন্দ নয়। কিন্তু অর্ঘ্যর তো নড়ার উপায় নেই।

অর্ঘ্য গলা ঝাড়ল, "না মানে... ভাবছিলাম..."

"বিকেল সন্ধেতেও যেতে পারিস। ট্রেন মোটামুটি ফাঁকা পাবি।"

আর তো ধানাইপানাই চলবে না, সোজাসুজি কথাটা পাড়তেই হয়। একটু সময় নিয়ে অর্ঘ্য বলল, "আসলে কী হয়েছে জানো, আমি যে প্রোজেক্টটা হাতে নিয়েছি, তার জন্য গ্রামের মানুষদের বিস্তর ডাটা লাগবে। স্যোশাল ইকনমিক। শুরু করেছিলাম সেই অন্ধ্র থেকে। তারপর মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডেও প্রচুর তথ্য নিয়েছি, এবার আমার টার্গেট ওয়েস্ট বেঙ্গল। লাল্টুদার মুখে যখন তোমার কথা শুনলাম... তুমি বিশাল কাজকর্ম করছ... এবং সেটা গ্রামের মেয়েদের নিয়ে... তখনই আমার মাথায় প্ল্যানটা আসে।"

"কী প্ল্যান?"

"ওই...মানে...তুমি যখন আছ... মিছিমিছি ডাটার সন্ধানে কেন অন্ধের মতো ঘুরে মরি..."

অহনা গম্ভীর মুখে বলল, "বুঝেছি। ওমনি ভাবলি এখান থেকে কিছু মালমেটিরিয়াল নিয়ে যাবি, তাই তো?"

"উঁহু। আমি নিজেই তথ্য সংগ্রহ করতে চাই। ধরো তোমার কাছ থেকে কিছু ডিরেকশন আর রেফারেন্স নিয়ে নিলাম, তারপর নিজেই গ্রামে গ্রামে ঘুরব।"

"যাহ, তা কী করে সম্ভব? কলকাতা থেকে রোজ অ্যাদ্দুর উজিয়ে এসে..."

"যদি আমি আলাইপুরে থেকে যাই?" অর্ঘ্য ঢিলটা ছুড়েই দিল, "তোমাদের এখানে?"

"মানে?"

“যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে...।” অর্ঘ্য তার পেটেন্ট নির্মল হাসিটা বিস্তার করল, “বেশিদিন জ্বালাব না। প্রমিস। বড়জোর মাস খানেক। যদি খ্যামাঘেন্না করে আশ্রয় দাও, কাজটা তুলে ফেলি।”

অহনা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। বোঝাই যায় এমন একটা প্রস্তাবের জন্য আদৌ তৈরি ছিল না। কী ভাবছে? সন্দেহ করছে না তো অর্ঘ্যকে?

অহনা বিড়বিড় করে বলল, “আমি আর মা এখানে কত কষ্ট করে আছি...”

“আমিও কষ্ট করে থেকে যাব।” গলায় একটা তরল তরল ভাব ফোটাল অর্ঘ্য, “জাস্ট দু’বেলা দু’মুঠো অন্ন দিয়ো, ব্যস।”

“আর থাকবি কোথায়? ওই গুদামঘরে?” অহনা মাথা দোলাচ্ছে, “এক রাত্তিরের জন্য নয় চলে যায়, কিন্তু টানা এক মাস...!”

“পারব অণুদি। যদি চাও তো তোমাদের দুয়ারের কোণে পাপোশের মতো পড়ে থাকতে পারি।”

থমথমে হয়ে গেছে অহনার মুখখানা। আস্তে আস্তে মেঘ সরে হাসি ফুটল। অর্ঘ্যরও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। অণুদি বোধহয় বুঝে গেছে এর সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল। হয় চূড়ান্ত অভদ্র হতে হয়, নইলে ঘাড় পেতে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

নিশ্চিন্ততায় পলকা চিড়। ফের অহনার গলা বাজছে, “মাকে বলেছিস?”

“না গো। আমি তো জানি তুমিই হাই কম্যান্ড।” অর্ঘ্যর স্বর মাখন, “তুমি রাজি হলে শেফালিমাসি কখনও না বলবে না।”

ব্যস, পটে গেছে অণুদি। শেফালি চা নিয়ে ঢুকছিল, তাকে জানাল কথাটা। সে তো শুনে মহা আহ্লাদিত। খুশিখুশি গলায় বলল, “থাক না যদ্দিন ইচ্ছে। বয়স হয়েছে তো, আদর-যত্নের ত্রুটি হলে মনে কিছু করিস না বাবা।”

“বেশি যত্নআত্তি আমার সয় না মাসি। বরং থাকার ট্যাক্স হিসেবে আমায় দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নিতে পারো।”

শেফালির বেশ মজা লেগেছে। ভুরু নাচিয়ে বলল, “কী কী পারবি করতে?”

“এনিথিং। শুধু কুটনো কোটা আর রান্নাবান্নাটা বাদে।” বস্তারের জঙ্গলে ক্যাম্প করে থাকার দিনগুলো মনে পড়ল অর্ঘ্যর। তাড়াতাড়ি বলল, “তবে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিতে পারব। ডিম-আলু দিয়ে।”

“থাক। রাঁধাবাড়ার জন্য আমার কৃষ্ণা আছে।... আর কিছু?”

“এই ধরো, যে ঘরখানা আমায় অ্যালট করেছ, ওটা সাফসুফ করে দিতে পারি। তারপর...” অর্ঘ্য তিলেক ভাবল, “তোমার বাগানে নিড়েন দিয়ে দিতে পারি। মাটি এমন ঝুরো ঝুরো করে দেব, তোমার বেলি ফুল সংখ্যায় ডবল হয়ে যাবে। রঙ্গনের ঝাড় বড্ড ঝাঁকড়া হয়েছে, ওগুলোও একটু ছাঁটাছাঁটি দরকার। আই ক্যান ডু ইট।”

“বাবার কাছে ট্রেনিং নিয়েছিস বুঝি?” শেফালির চোখে যেন স্মৃতির ঝাপটা লেগেছে, দূরমনা স্বরে বলল, “কী দারুণ গোলাপ ফোটাতেন অরবিন্দবাবু। অমন প্রকাণ্ড ডালিয়া আমি আর কোনও বাগানে দেখিনি। কী কী সার লাগবে, সব আমাদের বলে দিতেন, কিন্তু আমাদের হাতে অমনটা হতই না।”

“হুম। বাবার হাতে ম্যাজিক ছিল।”

“এখন তো ফ্ল্যাটে থাকছেন, সেখানেও নিশ্চয়ই টবে বাগান করেছেন?”

“অত স্পেস নেই ফ্ল্যাটে। ওই নিয়মরক্ষের মতো দু’-একটা...”

“এ বছর গোলাপ আমি লাগাবই। গোলাপ না ফুটলে বাগানে শোভা আসে না।” পলক কী যেন ভাবল শেফালি, তারপর রীতিমতো উত্সাহিত স্বরে বলল, “অরবিন্দবাবুর ফোন নম্বরটা দে তো। পুরনো আলাপটাও ঝালানো হবে, তখন গোলাপ ফোটানোর গুপ্ত রহস্যও আর একবার জেনে নেব।”

অর্ঘ্য প্রমাদ গুনল। এমন অজানা অচেনা কোণ থেকে শর এসে যায়, ঠেকানো মুশকিল। অস্বস্তি চাপা দিতে মুখে একটা হাসি টেনে বলল, “আচ্ছা, নিয়োখন।”

“বয়স হচ্ছে, সাত কাজে শেষে ভুলেই যাব হয়তো।” শেফালি ফের আবদার জুড়লেন, “এখনই দে না বাবা। ...অণু, নম্বরটা তোর মোবাইলে তুলে রাখ।”

“এক্ষুনি নিয়ে তো লাভ হবে না মাসি।” অর্ঘ্য ফস করে বলে দিল, “বাবা মা তো এখন আসানসোলে নেই।”

“কোথায় গেছেন?”

“দিদির কাছে। মানে সিঙ্গাপুরে।”

“বেড়াতে?”

“হ্যাঁ। দিদিই প্রায় জোর করে দু’জনকে...” অর্ঘ্য একটা বড় সাইজের দম নিল, কথাটাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য বলল, “বাবা মা তো আগে বিদেশ যায়নি, বুড়ো বয়েসে দিদির দৌলতে এবার একটু ঘুরে নিচ্ছে। সেই পুজো অবধি নাকি থাকবে ওখানে।”

“খুব ভাল। ছেলেমেয়েদের কাছে বাবা-মা তো এইটুকুই চায়। শেষ বয়সে একটু শান্তি, একটু হাত পা ছড়িয়ে নাতি-নাতনি সব্বাইয়ের মাঝে হইহই করে অবসর জীবনটা কাটানো...।” শেফালি ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “তা দুনিয়ায় সবার কপালে কি সব সুখ জোটে? কাউকে কাউকে তো মরণ অবধি জোয়াল টেনে যেতে হয়...”

অর্ঘ্যর নজরে পড়ল, অহনার মুখমণ্ডলে ছায়া ঘনাচ্ছে ক্রমশ। অর্থাৎ, মহিলার আফশোসের লক্ষ তার মেয়েই। অণুদির জীবনটা যে প্রচলিত ছকের একটু বাইরে, এ বুঝতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু মেয়ে যে মাকেও দুঃখী করে তুলেছে, ভাবতে খারাপ লাগে বই কী। নিজের জীবন-যাপনের ধারা থেকেই তো এই সত্যিটা প্রতিনিয়ত টের পায় অর্ঘ্য। মা কি অর্ঘ্যর চিন্তায় আকুল হয়ে থাকে না দিন

রাত? কিন্তু অর্ঘ্য তো নিরুপায়। একটা আদর্শ তাকে ঠেলে বের করে দিয়েছে ঘর থেকে? অণুদিরও কি তাই? লাল্টুদা কি একটা প্রসঙ্গে যেন অণুদির বিয়ের কথা একবার তুলেছিল সেদিন, তারপর ব্যাপারটা এড়িয়েও গেল...। বরের সঙ্গে থাকতে না পারা, বিয়ে ভেঙে যাওয়া, এসব তো আজকের দিনে কোনও ঘটনাই নয়... অণুদির সমস্যা কি তার চেয়েও গভীর কিছু? যা শুধু মেয়েকে নয়, মাকেও পীড়িত করে চলেছে, বিদ্ধ করছে দু'জনকেই?

ঘরের পলকা গুমোট কাটাতে অর্ঘ্য বলল, "আমার কাজের পুরো লিস্ট কিন্তু এখনও পাইনি মাসি।"

"আমার কোনও সাহায্য লাগবে না। তুমি খাও, দাও, ঘোরো, নিজের কাজ করো..."

"সে তো অতিথির মতো থাকা। ও আমার পোষাবে না।" অর্ঘ্য অহনার দিকে ফিরল, "আমি তোমাকেও সার্ভিস দিতে পারি, অণুদি।"

অহনা সামান্য হাসল। প্রায় না হাসার মতোই। নীরস গলায় বলল, "আমি চাই না, কেউ আমার জন্য খাটুক।"

জবাবটা যেন শুধু অর্ঘ্যকে নয়, শেফালিকেও শোনাল অহনা। চায়ের কাপ-প্লেট তুলে নিয়ে, মেয়েকে একটা অসন্তোষমাখা ভ্রূকুটি হেনে অন্দরের পানে হাঁটা দিয়েছে।

অপসৃয়মাণ শেফালিকে দেখতে দেখতে অর্ঘ্য গলা একেবারে খাদে নামিয়ে বলল, "তোমাদের মা-মেয়ের মধ্যে সারাক্ষণ একটা লড়ালড়ি চলে মনে হয়?"

অহনার কপালে ঢেউ। খানিক যেন কেঠো স্বরে বলল, "এখন ঘরে থাকছিস? না বেরোবি?"

অর্ঘ্যর সরল কৌতূহল এড়াতে চাইছে অণুদি? প্রসঙ্গটা আর খোঁচাল না অর্ঘ্য, আলগা ভাবে বলল, "রোদ চড়া হওয়ার আগে তোমাদের আলাইপুরটা একটু সফর করে আসি।"

"কাজে বেরোবি কখন?"

"দেখি। আজ ভাবছি বাড়িতে বসে কোশ্চেনেয়ারগুলো রেডি করি।"

“তোদের তো তৈরিই থাকে।”

“তা থাকে। তবে কিনা...।” অর্ঘ্য ঢোঁক গিলল, “আসলে আমাদের একটা ব্রড আউটলাইন দেওয়া হয়। তবে এক এক রাজ্য তো এক এক রকম, রীতিনীতি-কাস্টম-কালচার ফুড-হ্যাবিট, চাষবাসের পদ্ধতি সব আলাদা। এমনকী পারিবারিক কাঠামোও স্টেট টু স্টেট ডিফার করে। সেইজন্য প্রশ্নগুলোও বদলে বদলে যায়।”

“হুম। তা এখানে কতগুলো গ্রাম সার্ভে করবি ভাবছিস?”

“অন্তত গোটা দশেক গ্রাম তো বটেই। তবে এগজ্যাক্টলি কোথায় কোথায় যাব সেটা তুমি আমায় সাজেস্ট করবে।”

“আমার তো মনে হয়...”

অহনা থেমে গেল। বাইরে একটা মেয়ের গলা। ‘ম্যাডাম, ম্যাডাম’ বলে ডাকছে। উঠে গেল অহনা। অর্ঘ্য একটু স্বস্তিবোধ করল। এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছিল অণুদি, বাপস! বোঝাই যায়, এইসব সমীক্ষার ব্যাপারে অণুদি যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল। সুতরাং ভাঁওতাবাজি চলবে না, সত্যি সত্যি কিছু প্রশ্ন বানাতে হবে। এবং ঘুরতেও হবে গ্রামে গ্রামে। মোদ্দা কথা, এমন কিছু করা চলবে না যাতে কণামাত্র সন্দেহ জাগে অণুদির মনে।

বাইরে একটা চেঁচামিচি হচ্ছে না? হ্যাঁ, অণুদি কড়া গলায় ধমকাচ্ছে! অর্ঘ্য সোফা ছেড়ে বাইরের দরজাটায় এল। দেখল গ্রিলগেট খুলে নেমে গেছে অহনা। তার সামনে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছে এক বছর তিরিশের মহিলা। শ্যামলা শ্যামলা রং, গ্রাম্য চেহারা, মুখখানা তেমন সুশ্রী না হলো চোয়াড়ে মার্কা নয়, সিঁথিতে মোটা সিঁদুর।

অহনা তর্জনী উঁচিয়ে বলছে, “আমি কোনও অজুহাত শুনতে চাই না। কালই তোমার হরিণবাড়ির টাকাটা তুলে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার কথা ছিল, কি ছিল না?”

“বললাম তো ম্যাডাম, ছিল।” মহিলা মিনমিন করছে, “কাল আমার মেয়েটা এমন...”

“জাহান্নমে যাক তোমার মেয়ে। আমার দিনের কাজ দিনে হবে না কেন? দেরির জন্য ব্যাঙ্ক যদি বাড়তি সুদ দাবি করে সেটা কে দেবে? তুমি? না তোমার মেয়ে?”

“আমার অন্যায় হয়ে গেছে ম্যাডাম। তাই তো মেয়েটাকে জ্বর গায়ে ফেলেও ছুটতে ছুটতে এসেছি। যদি মায়া আজ হরিণবাড়ি গিয়ে টাকাটা তুলে নেয়... শুধু এবারকার মতো...”

“না। যার কাজ সে করবে। মাইনে নেবে তুমি, কমিশন পাবে তুমি, আর কাজটা চাপাবে অন্যের ঘাড়ে, এ আমি অ্যালাউ করব না। আজ চারটের মধ্যে টাকা ডিপোজিট করে ব্যাঙ্ক থেকেই আমায় ফোন করবে। যদি না পারো তো বলো, আজই আমি অন্য মেয়ে খুঁজব।”

শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা। আটপৌরে শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে সাইকেলে উঠে বসল। বেঁটে পাঁচিল পেরিয়ে ইটভাটার আড়ালে মিলিয়ে গেল সাইকেল।

অর্ঘ্য রীতিমতো বিস্মিত। তার দিদির বন্ধু, আসানসোলের সেই হাসিখুশি তরুণীর যে এমন একটা চণ্ডমূর্তি থাকতে পারে, এ যেন চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। মাঝে অবশ্য অনেকগুলো বছর কেটেছে, হয়তো সময়ের আঁচে বদল ঘটেছে অণুদির। সে নিজেও কি আর সেই বিন্দাস ছেলেটি আছে এখনও?

অহনা ঘরে ফিরতেই অর্ঘ্য লঘু সুরে বলল, “তোমাকে তো সমঝে চলতে হবে, অণুদি। তুমি তো বহুত রাগী আছ!”

জবাব দিল না অহনা, আবার উলটোচ্ছে ম্যাগাজিন।

অর্ঘ্য ঈষৎ কৌতূহলী স্বরে বলল, “টাকাপয়সা জমা দেওয়ার ব্যাপারটা কী? আশাবরী কি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড?”

“কক্ষনও না। অহনা চিটিংবাজির ব্যাবসা করে না।” অর্ঘ্যকে চমকে দিয়ে অহনার স্বর রুক্ষ সহসা। পরক্ষণেই স্বর নামিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলল, “আশাবরী মেনলি একটা মাইক্রোফিনান্স কোম্পানি। আমরা গ্রামে গ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তার মেম্বারদের নানান ছোটখাটো কারবারে লোন দিই।”

“তাই বলো।” অহনার আকস্মিক ভাবান্তরে সামান্য থতমত খেয়েও সামলে নিয়েছে অর্ঘ্য। হালকা ভাবে বলল, “তুমি এখন গ্রামের মহাজন। স্মল অ্যামাউন্ট ধার দিয়ে চড়া সুদে পয়সা উসুল করো।”

“হ্যাঁ, সুদটা একটু বেশিই নিই। কারণ, গ্রামের লোককে তো ব্যাঙ্ক সহজে উপুড়হস্ত করে না, করলেও তার ফ্যাকড়া সামলাতে গরিবগুরবোদের যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হতে হয়। তাই আশাবরীই ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে গাঁয়ের লোকদের দরকারগুলো মেটায়। তার জন্য মূল্য নেব না?” অহনা টেরিয়ে তাকাল, “ফর ইয়োর ইনফর্মেশন, আমার প্রতিটি দেনাদারই মেয়ে। ফিমেল জেন্ডার। এবং তারা কেউ শহুরে বেওয়াসিদের মতো টাকা মারে না।”

মাইক্রোফিনান্সের ব্যাবসা অর্ঘ্যর মোটেই অজানা নয়, অন্ধ্রে আর ঝাড়খণ্ডে অজ গাঁয়েও দেখেছে এদের কাজ-কারবার। তবে তারাও সেখানে শোষণের যন্ত্র, গরিবদের প্রাণভরে চোষে। অণুদির কারবার কি একটু ভিন্নগোত্রের? কিন্তু অণুদি মেয়েটার সঙ্গে যে আচরণ করল, তাকে তো আসানসোলের এমোড়ে-ওমোড়ে চরে বেড়ানো সুদখোরদের চেয়ে আলাদা কিছু মনে হল না।

অর্ঘ্য কৌতুকের সুরে বলল, “তা হলে লাভ তো তোমার ভালই হয়।”

“তো?”

“বউটাকে অত ঝাড় না দিলেও পারতে। যার বাচ্চা অসুস্থ...”

“আমার দয়ামায়া কম।... আর কিছু বলার আছে?”

ফের পালটা ঠাট্টা জুড়তে যাচ্ছিল অর্ঘ্য, তখনই টের পেল, কম্পন চালে রাখা মোবাইলটা বাজছে পকেটে। প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় হাত চলে গেছে মোবাইলে, বের করে নম্বরটা দেখেই আবার ঢুকিয়ে রাখল পকেটে।

অহনা জিজ্ঞেস করল, “কে রে? ধরলি না যে বড়?”

ভিতরের চোরা উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রেখে অর্ঘ্য তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, “সার্ভিস প্রোভাইডারের ফোন। নানান স্কিম শোনায়। বড্ড বিরক্ত করে।”

“ও।”

“আমি তা হলে একটু চরে আসি।”

অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে বেরিয়ে এল অর্ঘ্য। হনহন পা চালিয়ে নদীর পাড়ে। ঘোলাটে গঙ্গা, সামনে ডিঙিনৌকোর সার, অদূরে নদীর মধ্যিখানে গজিয়ে ওঠা চমত্কার একটা দ্বীপ... কিছুই চোখে পড়ল না অর্ঘ্যর। কাছাকাছি লোকজন নেই দেখে মোবাইল বার করে অস্থির আঙুলে বোতাম টিপছে। রিং হচ্ছে ওপ্রান্তে। থামল ধরেছে।

“কমরেড, সাড়া পাচ্ছি না কেন? হাইড-অ্যান্ড-সিক গেমটা এবার বন্ধ করা যায় না?”

দেহাতি হিন্দি। তেজসের গলা! সর্বনাশ, তেজস এই নম্বরে কেন! তার নম্বরই বা পেল কী করে তেজস?

.

॥ ৪ ॥

সকালে আজ জলখাবার খেয়েই জরুরি কাজে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল অহনাকে। গিয়েছিল সেই বিলাসডাঙা। মোপেডেই আলাইপুর থেকে প্রায় চল্লিশ মিনিটের পথ। বিলাসডাঙা ছোট গ্রাম, মেরে কেটে পঞ্চান্ন-ষাট ঘর মানুষের বাস, সমস্ত পরিবারই মুসলমান। বছর খানেক হল, গ্রামের মেয়ে বউরা

নিজেদের উদ্যোগে একটা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়েছে, তাদের সদস্যরা আশাবরী থেকে ধার নিচ্ছে নিয়মিত, ঋণশোধেও তাদের কোনও গাফিলতি নেই। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। রাজিয়া আহমেদ নামের এক বউ আশাবরীর টাকায় বেশ কিছু হাঁস-মুরগি কিনে পুষেছিল, দিব্যি ডিম বেচছিল, মিনি পোলট্রিও বাড়ছিল ধাপে ধাপে। হঠাৎ ধসা রোগে তিন দিনে হাঁস-মুরগি খতম। সেই শোক ছাপিয়ে রাজিয়ার এখন চিন্তা, আশাবরীর দেনা শুধবে কী করে।

এমন ধারার বিপত্তি অহনার কাছে নতুন কিছু নয়। আগাম সতর্কতাও নেওয়া থাকে কিছু। রাজিয়াদের দলটার সঙ্গে কারবার শুরু করার সময়েই বলে দিয়েছিল, গোষ্ঠীর মেয়েরা নিজেরাই যেন মাস মাস টাকা জমিয়ে একটা ফান্ড তৈরি করে। বেশি নয়, বিশ-পঁচিশ টাকা দিলেই যথেষ্ট। আজ গিয়ে অহনা দেখল সেই টাকাই জমে এখন প্রায় ছ'হাজারে দাঁড়িয়েছে। মেয়েদের জড়ো করে অহনা বুঝিয়ে এল, ওই টাকা থেকেই একলপ্তে শোধ করে দিক অহনার প্রাপ্য, তা হলেই আবার নতুন করে ধার মিলবে, আবার রাজিয়া শুরু করতে পারবে পোলট্রির ব্যাবসা। অবশ্য নিজেদের ফান্ড থেকে নেওয়া টাকাও তাকে শুধতে হবে মাসে মাসে। বিশ-পঁচিশের জায়গায় দিতে হবে চল্লিশ-পঞ্চাশ।

এত সহজ সমাধান পেয়ে রাজিয়ার দুঃখ উবে গেছে। বাকি মেয়েরাও বেশ পুলকিত। ঘর থেকে মিষ্টিমাষ্টা এনে অহনাকে আপ্যায়ন করতে যাচ্ছিল, তবে আশাবরীর ম্যাডাম সে সুযোগ দিলে তো। মুখে মেয়েগুলো যতই গদগদ ভাব দেখাক, আসলে তো এরা আশাবরীর ক্লায়েন্ট। যাদের সঙ্গে সম্পর্কটাই কেজো, তারা হঠাৎ আশাবরীর ম্যাডামকে ঘরের লোক ঠাউরে বসবে, এমনটা অহনা হতেই দেবে না। দুনিয়াটাকে চিনে গেছে অহনা, তার আপনজন বাড়ানোর কোনও সাধ নেই।

সুতরাং কাজ ফুরোতেই ফের মোপেড। সকাল হাঁই হাঁই করে এগোচ্ছে দুপুরের পানে। সূর্যদেব গনগনে চোখে আগুন ঝরাচ্ছেন যেন। মাঝে অনেকটা পথ, দু'ধারে কোনও গাছপালা নেই। রোদের দাপটে জ্বলে যায় গা-হাত-পা। মাঝে তারকনগরে পিচ পড়ছে রাস্তায়। বোধহয় আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের

প্রস্তুতি। একটা মিনি রোড রোলার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে। নেমে মোপেড ঠেলতে ঠেলতে হাঁটতে হল বেশ খানিকটা। যখন বাড়ি এসে পৌঁছোল, ঘামে ধুলোয় চ্যাটচ্যাট করছে অহনার সর্বাঙ্গ।

এক্ষুনি একটা স্নান দরকার। তার আগে রুটিন মাফিক আশাবরীর অফিসে ঢুঁ দিল অহনা। বাইরে থেকে মেয়েলি গলার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, অহনা ঢোকামাত্র অখণ্ড নীরবতা। সাতজন মেয়েই ভারী মন দিয়ে কাজ করছে। ম্যাডামের মর্জি মালুম না হওয়া পর্যন্ত তাদের মুখ থেকে কুলুপ হঠবে না।

অহনা নিজের ঘরটিতে এল। নেহাতই ছোট অফিসকক্ষ। খান চারেক চেয়ার, একটা সাদামাটা টেবিল আর একখানা স্টিলের ক্যাবিনেটেই ঘরের অর্ধেকটা ভরে আছে।

স্ট্যান্ড ফ্যানখানা চালিয়ে দিয়ে অহনা বসল নিজের আসনে। অন করল কম্পিউটার, টানল বিল চালানের ফাইল। কাল আবার যাবে কলকাতায়। মেহতা অ্যাসোশিয়েটসে দেড় মাস আগে মাল ডেলিভারি হয়েছে, সম্ভবত কাল পেমেন্ট মিলবে, বিলের কপিটা ব্যাগে রাখা দরকার।

ইলা দরজায়। পাশের গ্রাম ঈশ্বরপুরের মেয়ে, আলাইপুরের বউ। আশাবরীতে সৌরবিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি তৈরির জন্মলগ্ন থেকে কাজ করছে ইলা। কাজেকর্মে যেমনি দড়, গল্পগাছায় তেমনি ওস্তাদ। তবে সবচেয়ে বড় গুণ, খুব বিশ্বাসী। আশাবরীর স্টোরের মালপত্র ইলার জিম্মাতেই রেখেছে অহনা।

অহনা স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষ স্বরে বলল, “উঁকি মারছ কেন? কী চাই?”

“একটা চিঠি এসেছে। বিডিও অফিস থেকে।”

ভ্রূকুটি করল। সরকারি চিঠি মানেই কোনও বখেড়া নির্ঘাত। সরকার তো ভাল কাজে লাগে না, শুধু ঝামেলা পাকানোর জন্যই মুখিয়ে থাকে। অহনা কী অপরাধ করল কে জানে!

অহনা জিজ্ঞেস করল, “কখন এল?”

“এই তো, আধ ঘণ্টাও হয়নি।” আঁচলের আড়াল থেকে বাদামি খামটা বার করে বাড়িয়ে দিল ইলা, “সাইকেল মেসেঞ্জার এনেছিল, দেওয়ার সময় কাগজে সই করিয়ে নিল।”

ধুকপুকুনিটা আরও বেড়ে গেল যেন। লেফাফার মুখটা ছিঁড়ে চোখ রেখেছে সরকারি পত্রে। পড়তে পড়তে চোখ বড় বড়। চিঠির প্রেরক কৃষ্ণনগর ডি-এম অফিস। দিল্লির পরিবেশ দপ্তর নাকি গ্র্যান্ট পাঠিয়েছে। অফিসে অফিসে পরিবেশবান্ধব বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কেনার জন্য। আশাবরীর উপর হঠাৎ নেকনজর পড়েছে জেলাশাসক দপ্তরের, তারা আশিখানা সোলার ইমার্জেন্সি লাইট সাপ্লাই দিতে বলছে আশাবরীকে। দামটা বেশ ভালই দেবে, ডিলারদের অহনা যে রেটে বেচে, তার চেয়ে প্রতিটি পিসে একশো সাঁইত্রিশ টাকা বেশি। তবে চিঠি পাওয়ার একুশ দিনের মধ্যে ডেলিভারি শেষ করতে হবে, মাল কৃষ্ণনগরে পাঠাতে হবে নিজের খরচায়... ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠি শেষ করে অহনা থম মেরে বসে। আশিটা আলো বিক্রি করে ফেলে ছড়িয়ে চল্লিশ হাজার টাকা লাভ থাকবে অর্থাৎ দু'মাস কারখানা চালানোর প্রায় যাবতীয় খরচ উঠে আসবে, তবু যেন আনন্দ হচ্ছে না কণামাত্র। শুধু মনে হচ্ছে আরও যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেল। কেন যে কোনও সমাচারেই হৃদয়ে প্রফুল্লতা জাগে না।

ইলা দাঁড়িয়েই আছে। একটু যেন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, "খারাপ খবর আছে নাকি কিছু?"

"নাহ।" অহনা শ্বাস ফেলল, "গুড নিউজ। একটা বড় অর্ডার পেয়েছি।"

"আমি জানতাম, আমি জানতাম।" ইলার গলায় উচ্ছ্বাস, "আগেই বুঝেছি ভাল খবরই এসেছে।"

"এমনটা ভাবার কারণ?"

"বিডিও অফিসের লোকটা বলল যে।"

"কী বলল?"

"তোমার ম্যাডামকে বলে রেখো, একদিন এসে মিষ্টি খেয়ে যাব।"

এমন আবদারে হেসে ফেলাটাই ছিল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু অহনা ঝপ করে রেগে গেল। ঝাঁঝালো স্বরে বলল, "বায়নার বলিহারি। পরিশ্রম করবে আশাবরী, আর মিষ্টি খাবেন ওঁরা!"

অহনার মুড দেখে সরে পড়ছিল ইলা, পেছন থেকে ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গম্ভীর সুরে অহনা বলল, “আমাদের ক’খানা ইমার্জেন্সি লাইট রেডি আছে?”

“আট পিস। চারটে রানাঘাট যাবে, চারটে কল্যাণী।”

“একটাও ছাড়বে না এখন। আর কাল থেকে অন্য মাল তৈরি স্টপ। যদ্দিন না বলি, শুধু ওই একটা আইটেমই বানাও।”

“অনেকগুলো টর্চ আর সোলার কুকারের অর্ডার ছিল যে?”

“আহ যা আমি বলছি, তাই করবে। পাকামি মেরে নিজেরা কোনও ডিসিশন নেবে না।”

ঘাড় নেড়ে চলে গেল ইলা। অহনাও উঠি উঠি করছিল, কী ভেবে মোবাইলটা নিল হাতে। সুশোভন স্যারের নম্বরটা টিপছে।

ওফ কী জ্বালা, আউট অব রিচ! গেলেন কোথায় স্যার!

কিন্তু এই অর্ডার পাওয়ার খবরটা তো এক্ষুনি দিতে হবে স্যারকে। নিজের কাজের সূত্রে এখানকার প্রায় সব সরকারি অফিসেই স্যারের নিত্যদিন যাতায়াত, কেউ না কেউ আশাবরীর সুসমাচার ওঁকে শোনাবেই। তারা বলার আগে অহনা যদি না জানায়, স্যার দুঃখ পেতে পারেন। আর ওই মানুষটিকে আহত করা অহনার মোটেই সাজে না।

সত্যি, স্যার অনেক কিছু করেছেন অহনার জন্য! অহনা যখন আলাইপুরে পা রাখল, তখন তো সে মানসিক ভাবে যথেষ্ট বিধ্বস্ত। মা সঙ্গে রয়েছে বটে, কিন্তু মা তখন অহনার সঙ্গী নয়, স্রেফ বাস করে একত্রে। অবশ্য শেফালিকে কবেই বা মনের প্রাণের সঙ্গী ভাবতে পেরেছে অহনা! যাই হোক, অহনা তখন মানসিক ভাবে ভীষণ রকম একা। অথচ ভিতরে একটা ভয়ংকর ক্রোধ, উঁহু শুধু রাগ নয়, একটা তীব্র আক্রোশও যেন তাকে দগ্ধাচ্ছে দিনরাত। সে হেরে গেছে, তাকে চরম অপমানের মুখোমুখি হতে হয়েছে, অথচ সে কিছুই করে উঠতে পারছে না, নিদেনপক্ষে নিজের মতো করে বাঁচার উপায় পর্যন্ত

খুঁজে পাচ্ছে না, এই অসহায়তা যেন আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে জ্বালাপোড়া। কান্না পর্যন্ত আসে না তখন, টের পায় অশ্রুর উত্সটাই শুকিয়ে মরুভূমি...।

তখনই স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ হয় অহনার। সুশোভন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপক, অহনা তাঁর ছাত্রী ছিল এক সময়ে। টিয়াডাঙা স্টেশনের ওপারে সুশোভনের পৈত্রিক বাড়ি, রিটায়ারমেন্টের পর সেখানে একটা এনজিও খুলে অনাথ শিশুদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। গোটা অঞ্চলটাই চষে বেড়ান বলে কীভাবে যেন ছাত্রীর আলাইপুরে আগমনের খবরটা বোধহয় পৌঁছে গেছিল সুশোভনের কানে। নিজেই একদিন বাড়িতে এসে হাজির। অহনাকে দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে কিছু বোধহয় আন্দাজ করেছিলেন সুশোভন, তবে ছাত্রীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বাড়তি কৌতূহল দেখাননি। উলটে সুচতুর ভাবে কিছু একটা করে দেখানোর জেদ গেঁথে দেন অহনার মাথায়। শুধুই পাখিপড়ার মতো করে বোঝাতেন, জীবনটা অলস খাতে বয়ে যেতে দিয়ো না, কিছু একটা করো। অঙ্কে ছাত্রীর মাথা যথেষ্ট সাফ, জেনেই বুঝি মাইক্রোফিনান্সের ব্যাবসা করার বুদ্ধি দিলেন অহনাকে। আশাবরী নামটা অবশ্য অহনার পছন্দ। ঠাকুমা, ছোট্টবেলায় যে ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়জন, তার নামেই কারবার শুরু হল আলাইপুরে। যতটা না আলাইপুরের আশপাশের মানুষের জন্য, তার চেয়েও বেশি নিজের জন্য।

প্রথম প্রথম কথাটা মানতে চায়নি অহনা। নানান অছিলায় বন্ধ করে দিতে চেয়েছে আশাবরী। সুশোভন ছাড়েননি, অহনার প্রতিটি অসুবিধের জট সযত্নে ছাড়িয়েছেন। নিজেই খুঁজে দিয়েছেন আশাবরীর কয়েকজন মহিলা কর্মী, স্বনির্ভরগোষ্ঠী তৈরিতে সাহায্য করেছেন, যোগাযোগ তৈরি করে দিয়েছেন ব্যাঙ্কের সঙ্গে, হয়েছেন অহনার গ্যারান্টার...। আশাবরী যে এখন সৌরবিদ্যুতের নানান যন্ত্রপাতি বানাচ্ছে, এও তো সুশোভনের প্ল্যান। সুশোভন বলেছিলেন, লাভের আশা কোরো না, তোমার মাইক্রোফিনান্সের ব্যাবসায়ে যতটুকু যা বাড়তি হাতে আসবে, তার একটা অংশ এই কাজে লাগাও।

তোমার টর্চ-কুকার-হিটার ইমারজেন্সি ল্যাম্পই হবে আশাবরীর বিজ্ঞাপন। এর জোরেই তোমার মেন ব্যাবসায়ের গুডউইল তৈরি হবে।

কী আশ্চর্য, তাই হয়েছে কিন্তু! তার ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা কিন্তু ওই সোলার ইউনিটের সঙ্গে দিব্যি হাত ধরাধরি করে চলছে! যা একটা অর্ডার এল, এবার সোলারই না এগিয়ে যায়!

কিন্তু আরও গভীরভাবে কাজের জগতে গেঁথে যাচ্ছে অহনা, নয় কি? একসময়ে ভেবেছিল কোনও একটা কিছুতে ডুবে থেকে মনের ক্লান্তি কাটাবে, অথচ কাজই যেন বোঝার মতো চেপে বসছে। অহনার তো বিশেষ কোনও চাহিদা নেই, তা হলে ব্যাবসা বেড়েই বা লাভটা কী?

একটা বাজে। খিদে পাচ্ছে অল্প অল্প। চেয়ার ছেড়ে উঠল অহনা। পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল একটু। তার ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে। কিছুই অবশ্য বানানো হয় না আশাবরীতে, যন্ত্রাংশ কিনে এনে শুধু জোড়া লাগায় মেয়েরা। বাঁধা গতের কাজ, তবু শিখতে হয়েছে। ট্রেনিং দেওয়ার জন্য সুশোভন স্যারই একটা ছেলেকে জোগাড় করে দিয়েছিলেন। এখনও সে মাসে একদিন করে এসে চোখ বুলিয়ে যায় কাজকর্মে। মেয়েরা যদিও ভালই শিখে নিয়েছে। এবং করেও যথেষ্ট নিপুণ হাতে।

ফাইবার গ্লাসের ফ্রেমে সরু টিউবলাইট আটকাচ্ছিল স্বপ্না। কাজ থামিয়ে একটু যেন উসখুস করছে। অহনা ভুরু কুঁচকোল, “কিছু বলবে?”

“হ্যাঁ ম্যাডাম।” বছর পঁয়ত্রিশের শ্যামলা বউটি স্ক্রু-ডাইভারখানা রাখল পাশে, “আমাকে ক’দিন ছুটি দিতে হবে।”

“কেন?”

“ছোট জায়ের পেটে ক’দিন ধরেই বড় বেদনা হচ্ছিল। আমার দেওর বউকে রানাঘাট নিয়ে গিয়ে পেটের ছবি তুলিয়েছে। ডাক্তার বলছে পাথর হয়েছে, শিগগিরি অপারেশন করাতে হবে। তাই বলছিলাম...”

“অপারেশন তো তোমার হবে না?”

“বা রে, জা বিছানায় পড়ে থাকলে সংসার দেখবে কে? রান্নাবান্না, বাচ্চাদের সামলানো, ঘরদোরের আরও হাজারও রকম কাজ...”

“বুঝেছি, বুঝেছি।... তা কবে থেকে কামাই করবে? কদ্দিনের জন্য?”

“সামনের সোমবার যুথি ভরতি হবে হাসপাতালে। ওই দিন থেকে ধরুন আরও দু’সপ্তাহ। পারলে তার আগেই কাজে লেগে যাব।”

“থাক, বাজে কথা বোলো না। এক মাসের আগে তোমার টিকি দেখা যাবে না।” অহনা গজগজ করে উঠল, “যেই না একটা বড় কাজ এল, অমনি তোমাদেরও বায়নাক্কা শুরু হল।... তা তোমার কাজ কে তুলবে?”

দিলারা বলে উঠল, “আমি করে দেব। দরকার হলে ওভারটাইম খাটব।”

মিতা বলল, “তুমি তো চারটে বাজলেই ঘনঘন দড়ি দ্যাখো, বাড়তি সময় তুমি থাকবে কী করে? বরং আমি...”

বাকি মেয়েরাও স্বপ্নার হয়ে খেটে দিতে রাজি। কেউই তেমন উচ্চকিত নয়, তবে চাপা একটা রেষারেষির ভাব বেশ টের পাওয়া যায়। স্বপ্নার মজুরিটাই লক্ষ, কাজটা উপলক্ষ, অহনা জানে।

অহনা অবশ্য অন্য কথা ভাবছিল। বিশ্বজিতের মেজদি খুব ঘ্যানাচ্ছে, পরশুও শুকনো মুখ করে অনেকক্ষণ বসে ছিল অফিসে। ওকে যদি এই সময়টায় নেওয়া যায়, মেয়েটা কাজ শিখে যাবে মোটামুটি। একটা কাজ জানা বাড়তি মেয়ে সর্বদাই হাতে থাকা দরকার, এতে বাকিদের কামাই করার প্রবণতা কমবে।

তুৎ, আবার সেই লাভ লোকসানের চিন্তা! এসব ভেবে কী হবে রে অহনা?

নিজেকে আলগা ধমক দিয়ে স্বপ্নার ছুটি মঞ্জুর করে অহনা বাড়িতে ঢুকল। অর্ঘ্যও ফিরেছে, মধ্যাহ্নভোজ সেরে গড়াচ্ছে ছোট ঘরটায়। আবার বোধহয় বিকেলে বেরোবে।

শেফালি মেয়ের জন্যই অপেক্ষা করছিল। গায়ে মাথায় জল ঢেলে এল অহনা। মা-মেয়ে বসেছে আহারে।

খেতে খেতে শেফালি বলল, "ঝুমা আজ সকালে ফোন করেছিল। অনেকক্ষণ গল্প হল।"

অহনা খুব একটা গুরুত্ব দিল না। আলগা ভাবে বলল, "ও।"

"টুকাইয়ের তো গরমের ছুটি চলছে। ঝুমারও।"

"তোমার ছেলের বউ আর নাতির স্কুলে গরমকালে সামার ভেকেশন হয়, এটাই ঘটা করে শোনাল বুঝি?"

মেয়ের বাঁকা মন্তব্যে শেফালি যেন একটু গুটিয়ে গেল। সামান্য চুপ থেকে বলল, "তা নয়...। ঝুমা বলছিল সামনের সপ্তাহে বাপের বাড়ি যাবে। টুকাইকে নিয়ে। পুজোর সময়ে যাওয়া হয়নি, এবারও নাকি লাল্টু অক্টোবরে সাউথ ইন্ডিয়া যাওয়ার প্ল্যান করছে, তাই এখন দিন দশ-বারোর জন্য ঘুরে আসবে।"

"খুব ভাল। এই সময়ে জলপাইগুড়ির আবহাওয়া নিঃসন্দেহে কলকাতার চেয়ে মনোরম। চাইলে ছেলেকে প্রাণ ভরে হাতি-গন্ডার দর্শন করিয়ে আনতে পারবে।"

"সে যা খুশি করুক। কিন্তু আমাকে ভারী বিপদে ফেলছে যে।"

সুরটা বিপন্নতার না আহ্লাদিপনার ঠিক ধরতে পারল না অহনা। ঝুমার সঙ্গে মা'র সম্পর্ক বিশেষ মধুর নয়, আবার তেমন একটা তেতোও নয়। ঝুমা অত্যন্ত চালাক মেয়ে, সামনাসামনি মা'র সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করে না। কিন্তু আড়ালে আবডালে যে টিপ্পনিগুলো ভাসায় তা যথেষ্ট জ্বালা ধরানো। মেয়ের ঘাড়ে চেপে মজাসে আছে মা, ছেলে-ছেলের বউয়ের সংসারের প্রতি শেফালি তার দায়িত্ব

পালন করল না...। অহনার ওপরেও মোটেই সন্তুষ্ট নয় ঝুমা। তার বদ্ধমূল ধারণা, দাদা-বউদিকে জাঁতা দেওয়ার জন্যই নাকি মাকে আটকে রেখেছে অহনা। যাতে বউদি টেনশনমুক্ত হয়ে স্কুলের চাকরিটা করতে না পারে, ছেলেকে ঠাকুমার ঘাড়ে চাপিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাটা আটকে যায়...। তবে ঝুমা তো মুখমিষ্টি টাইপ, এসব ক্ষোভ কখনও উষ্মার আকারে প্রকাশ করবে না। মিছরি মাখিয়ে ছাড়ে হঠাৎ হঠাৎ।

ঈষৎ কৌতূহল নিয়ে অহনা প্রশ্ন করল, "কেন? কী করল বউদি?"

"বলছে, জানেনই তো আপনার ছেলে কেমন ক্যালাস, ওকে একা একা রেখে যেতে ভরসা হয় না। তাই আমি গিয়ে যদি ক'দিন বেহালায় থাকি, ও নাকি নিশ্চিন্ত হয়।"

"ভালই তো। যাও। দাদাকে ক'দিন আদরযত্ন করে এসো।"

শেফালি ভৎসনার সুরে বলল, "যাহ, তা হয় নাকি?"

"না হওয়ার কী আছে? যাও তো মাঝেসাঝেই।" অহনা টেরিয়ে তাকাল, "আমি কি তখন জলে পড়ে থাকি?"

"কী যে বলিস না!" শেফালি হঠাৎ স্বর নামাল, "এখন কি আমার নড়ার উপায় আছে?"

"মানে? নেই কেন?"

গলা আরও খাদে নামিয়ে শেফালি প্রায় ফিসফিস করে বলল, "বা রে, ছেলেটা আছে না?"

"তো? ও ওর মতো থাকবে। যতটুকু যত্নআত্তি করার করব। মনে হয় ও কিছু মাইন্ড করবে না।" অহনা ঠোঁট ওলটাল, "আর করলেই বা আমার কী যায় আসে?"

"তুই দিনকে দিন আবোধা হচ্ছিস।" শেফালি যেন এবার বেশ বিরক্ত, "একটা ফাঁকা বাড়িতে তুই আর ওই ছেলেটা থাকবি... আমি দিব্যি ড্যাংডেঙিয়ে চলে যাব..."

এতক্ষণে শেফালির আপত্তির কারণ মগজে সেঁধিয়েছে অহনার। ওমনি যেন আগুন জ্বলে উঠেছে মাথায়। তীক্ষ্ন স্বরে বলল, “কী বলতে চাও তুমি? শুধু অর্ঘ্য আর আমি এখানে থাকলে কী হবে?”

“মুখ করছিস কেন? অনায্য কথাটা কী বলেছি?” শেফালিরও গলা চড়ে গেছে, “এমন একটা অস্বৈরণ ব্যাপার আমি ঘটাব? মা হয়ে?”

অপমানে কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল অহনার। অজানা অচেনা নয়, অহনারই বান্ধবীর ভাই, অহনার ভ্রাতৃতুল্য ভেবেই নাচতে নাচতে থাকতে দিল এখানে, অথচ এক বাড়িতে দু’জনকে ছেড়ে গেলে সর্বনাশ ঘটে যাবে। অহনা একটা আটত্রিশ বছরের মেয়ে, তাকে মেয়ে না বলে আধবুড়ি বললেই হয়তো বেশি মানায়, জীবনের চরম চরম কুত্সিত মুহূর্ত দেখে পুরুষ সম্পর্কে তার ভেতরটা কবেই শীতল হয়ে গেছে, তবু তার মতো এক প্রায় বিবাহবিচ্ছিন্না মেয়েকেও ভাইয়ের মতো একটা পুরুষের সঙ্গে ছেড়ে রাখতে মা’র বুক কাঁপে? তবে শেফালিও কি তাকে একটা ক্ষুধার্ত মেয়েমানুষ ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না? নাকি ধরেই নিয়েছে, নারী আর পুরুষ সারাক্ষণ জৈবিক লালসায় লকলক করে? মা তো নিজেও মেয়েমানুষ, বোঝে না এই অবিশ্বাস তার নিজের নারীসত্তারও অসম্মান?

অহনা বরফকঠিন স্বরে বলল, “তোমার কী ধারণা, তুমি না থাকলেই আমি অর্ঘ্যর সঙ্গে নষ্টামি শুরু করব? সেই কাজটা তো আমি তোমার সামনেও করতে পারি। পারবে আটকাতে?”

“আহ অহনা, আমি ওসব ভেবে বলিনি।” শেফালির গলা কাঁপছে, “তোকে নিয়ে ফের কথা উঠবে, পাঁচজনে কে কী বলবে, কানাকানি করবে... এই আলাইপুরে সবাই তোকে মান্যিগন্যি করে,... সেখানে যদি তোর চরিত্রে কাদার ছিটে লাগে... বুঝিসই তো, এরা গাঁয়ের মানুষ... শহরে যা চলে, তার অনেক কিছুই এদের চোখে দৃষ্টিকটু...”

“থাক মা, নিজের কথার সাফাই গাইতে গিয়ে এখানকার লোকদের তুমি ইনসাল্ট কোরো না।” অহনার গোলচে মুখখানা বিদ্রূপে বেঁকে গেল, “তোমরা শহরের লোকরা কী চিজ তাও তো জানতে আমার

বাকি নেই? আমাকে নিয়ে যে ভয়টা তুমি পাচ্ছ, সেই কাজটাই তো শহরে বুক ফুলিয়ে করছে কেউ কেউ, আর এই তোমরা গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে দেখতে হাততালি দিচ্ছ।”

“আমাদের তুই অকারণে দুষছিস।” শেফালির গলা এবার ভিজেভিজে শোনাল, “আমরা কেউই অন্যায়কে সাপোর্ট করিনি।”

“শুধু যে অন্যায় করছে, আমাকে তার পা চাটতে বলেছিলে। একটা ভুল করেছি বলে সারাজীবন ভুলটাকে মাথায় করে বইতে বলেছিলে।” অহনা সরু চোখে তাকাল, “সেই বোকাসোকা ভালমানুষ মেয়েটা, যে মরিয়া হয়ে তার আপনজনদের আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, মরে গেছে মা। সে এখন কী করতে পারে তুমি জানো না। দেখতে চাও?”

“কী করবি তুই?”

“দেখতে চাও কি না বলো?”

“তুই কোনও পাগলামির কথা বলবি নির্ঘাত।”

“না, মোটেই খ্যাপামি নয়। যে সংশয়টা তোমাদের মন থেকে কিছুতেই মোছে না, সেটাই হাতে কলমে করে দেখাতে চাই।” অহনার নাক দিয়ে হলকা বেরুচ্ছে, “এক্ষুনি ছোট ঘরে ঢুকে জামাকাপড় খুলে অর্ঘ্যকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ি?”

“আহ অণু, চুপ কর। শান্ত হ।” শেফালি প্রায় ককিয়ে উঠলেন, “আমার ঘাট হয়েছে। তুই এবার মুখে লাগাম দে।”

“দিতে পারি। যদি লাগাম ধরার অভ্যাসটা ছাড়ো।”

“তোমার ভালর জন্যেই বলা।... মা হয়ে আমি তো তোমার খারাপ চাইতে পারি না।”

“আবার? আবার সেই সেন্টুমারা ডায়লগ? কেন বোঝো না...”

অহনা ঝুপ করে থেমে গেল। অর্ঘ্য বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। পরনে বারমুডা আর টি-শার্ট। খাওয়ার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মা-মেয়ের থালায় চোখ বুলিয়ে বলল, “খুব সিরিয়াস টপিক নিয়ে আলোচনা চলছে বুঝি? ডালমাখা ভাত তো শুকিয়ে কাঠ?”

মুখে একটা হাসি টানতে হল অহনাকে। তরল করতে হল স্বর, “মাতাশ্রী মহোদয়াকে একটু কাউন্সেলিং করছিলাম।”

“কী বিষয়ে?”

“অ্যাডাল্ট সাবজেক্ট। বাচ্চাদের বলা যাবে না।” ঝটপট খাবারে হাত লাগাল অহনা। মুখে বড় গরাসে ভাত তুলে বলল, “আজ কোন দিকে গেছিলি?”

“কাছেই। ঈশ্বরপুর।”

“কাজ এগোচ্ছে?”

“শনৈঃ শনৈঃ মেন তথ্য যেটা পাচ্ছি, সর্বত্র আশাবরীর সুখ্যাতি।”

একটু যেন বেশি বেশিই প্রশংসা করে অর্ঘ্য। কিন্তু সত্যিই কাজ তেমন করছে কি? অহনার সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়েও গত তিন দিনে একবারও ছ’-সাত কিলোমিটার দূরের গ্রামে যেতে পারেনি এখনও। এক মাসে শেষ হবে তো কাজ? নয়তো এ ছেলে নড়বে না। এমন সুখের গৃহ পেয়েছে!

ফোন বাজছে অহনার। মায়া অফিসে এসেছে, কী যেন কথা আছে ম্যাডামের সঙ্গে। থালা শেষ করে চটপট উঠে পড়ল অহনা। আঁচাতে আঁচাতে শেফালিকে বলল, “তুমি তা হলে যাচ্ছ কলকাতা? নো মোর বাহানা?”

তাকে নিয়েই কথা, কিন্তু অর্ঘ্য যেন বুঝল না। একবার শেফালিকে দেখছে, একবার অহনাকে।

০৫. অধৈর্য বোধ করছিল অহনা

॥ ৫ ॥

বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য বোধ করছিল অহনা। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বুড়ো মতো লোকটা ম্যানেজারের ঘরে ঢুকেছে তো ঢুকেইছে, বেরোনোর নাম করছে না। কে এমন কেষ্টবিষ্টু কে জানে, ট্রে সাজিয়ে চা-বিস্কুট-মিষ্টি গেল অন্দরে। তুৎ, এভাবে পুরো সকালটা ব্যাঙ্কে নষ্ট করার কোনও মানে হয়?

জরুরি দরকার না পড়লে অহনা বড় একটা আসে না জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের এই শাখায়। ভাল লাগে না পরিবেশটা। ভিড় যথেষ্টই থাকে, কিন্তু কর্মচারীরা কেমন গা-ছাড়া। দেখে মনে হয় এইমাত্র ঘুম থেকে উঠল, এখনও খোঁয়াড়ি কাটেনি। টাকা জমা নিতে অনীহা, পেমেন্ট করতে বিরক্তি...। নেহাত সুদ এরা হাফ পারসেন্ট কম নেয়, নইলে কবেই অহনা এখান থেকে অ্যাকাউন্ট সরিয়ে নিত।

অহনা ঘড়ি দেখল। বারোটা পঁয়ত্রিশ। কৃষ্ণা বড়জোর একটা, সওয়া একটা অবধি থাকবে। চলে গেলে আর কিছু নয়, নিজেকেই ভাত বাড়তে হবে, খাবার-দাবার নিয়ে বসতে হবে টেবিলে। অজস্র গাঁইগুই সত্ত্বেও মাকে গতকাল বেহালা পৌঁছে দিয়ে এসেছে অহনা, এ ক'দিন কৃষ্ণাই তো ভরসা। বিশেষ করে এই দুপুরবেলাতে। কৃষ্ণা থাকতে থাকতেই অর্ঘ্য যদি সকালের চক্করটা সেরে ফিরে আসে তাও খানিকটা বাঁচোয়া, নইলে দামড়া খোকাটিকে খাওয়ানো দাওয়ানোর দায়িত্ব তো অহনার ঘাড়েই চাপবে। হ্যাঁ, খোকাই তো। অর্ঘ্যর ডাকনাম তো খোকাই। কাজেকম্মেও খোকা রয়ে গেছে এখনও। কাল রাত্রে বাড়ি ফিরে শরীর আর চলছিল না, অর্ঘ্যকে একটু চা বানিয়ে দিতে বলল, সে সরসুদ্ধ দুধটুধ দিয়ে যে দ্রব্যটি করে আনল, মুখে দেয় কার সাধ্যি! চুমুক দিয়ে নিজে পর্যন্ত বলছে, খুব অখাদ্য হয়েছে, না অণুদি! এদিকে কত না বারফাট্টাই কথা। অহনার বাড়ির সব কাজ নাকি করে দেবে! মাকে বাগানের কাজে সাহায্য তো দূরস্থান, নিজের ঘরটি পর্যন্ত এখনও সেই দশাতেই আছে। কৃষ্ণা হাত লাগাতে

গেলেও হাঁ হাঁ করে ওঠে। ছেলেটার বোধশক্তি বলে বোধহয় কিস্যু নেই, না হলে ওই ঘরে কেউ বাস করতে পারে!

ম্যানেজারের দরজা খুলেছে। অহনা টানটান। বেরোচ্ছে ধুতি-পাঞ্জাবি, সঙ্গে বিনয়ে গদগদ ম্যানেজার। প্রায় ব্যাঙ্কের গেট অবধি ভদ্রলোককে এগিয়ে দিয়ে ফিরছে। অহনার ওপর চোখ পড়ামাত্র হাসিহাসি মুখে বলল, "সরি। আপনাকে অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হল। আসুন।"

ভেতরে ঢুকে চেয়ারে বসতে বসতে অহনা জিজ্ঞেস করল, "ভদ্রলোকটি কে? আমাদের মতো হেঁজিপেঁজি নয়, নিশ্চয়ই কোনও বড় বিজনেসম্যান?"

"দূর, টিয়াডাঙায় আবার ব্যবসায়ী কোথায়! সব তো সবজিওয়ালা। বড়জোর সার-সিমেন্টের ডিলার।"

বছর পঞ্চাশের ম্যানেজারটি মুচকি হেসে চোখে একটা অর্থপূর্ণ মুদ্রা ফোটাল, "উনি আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।"

"মানে?"

"যে বোর্ড এই সমবায় ব্যাঙ্ক চালায়, উনি তার প্রেসিডেন্ট। সরকার বদলের পর আগের সভাপতিকে সরিয়ে এঁকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আজই প্রথম পা রাখলেন আমাদের ব্রাঞ্চে। একটু খাতির না করলে চলে!"

এতক্ষণে অহনার বোধগম্য হল ব্যাপারটা। নতুন সরকার আসার পর থেকেই চারদিকে পরিবর্তনের ঢেউ। স্কুল কলেজ ইউনির্ভাসিটি সমবায়, সর্বত্রই এখন পুরনো কমিটি ভেঙে যাচ্ছে, আসছে নতুন লোক। সাধারণ মানুষের তাতে কত লাভ হচ্ছে কে জানে, তবে নয়া দেবতাদের তুষ্ট রাখা তো ম্যানেজারবাবুদের পরম কর্তব্য। আগের জমানার মতোই ইনিও নিশ্চয়ই স্থানীয় রাজনীতির ওজনদার লোক, সেটাও তো ম্যানেজারবাবুকে মাথায় রাখতে হয়।

যাক গে, আদার ব্যাপারী অহনার জাহাজের খবরে কী দরকার! অহনা নিস্পৃহ স্বরে বলল, “তা আমাকে আবার ফোন করে ডাকলেন কেন? বললেন জরুরি কাজ আছে...”

“হ্যাঁ, আছে তো।” ম্যানেজার সোজা হয়ে বসল। টেবিলে হাত দুটো রেখে বলল, “আমাদের ব্যাঙ্কের তরফ থেকে একটা প্রস্তাব দিতে চাই।”

“কীরকম?”

“আপনার আশাবরীর ওভারড্রাফ্ট লিমিট আছে দশ লাখ। ওটা বাড়িয়ে বিশ লাখ অবধি করতে পারেন। অ্যাট লিস্ট মেক ইট ফিফটিন।”

“হঠাৎ এমন উদারতার কারণ? আমি তো অ্যাপ্লাই করিনি?”

“আমরা দেখছি আপনার অ্যাকাউন্টটা চমৎকার রান করছে। লোনের অ্যামাউন্ট বাড়ছে ক্রমশ, রিপেমেন্ট ইজ অলসো ভেরি রেগুলার। দ্যাট মিন্স আপনার ব্যাবসা ভালই চলছে। অ্যান্ড এক্সপ্যান্ডিং। সে জন্যই বলছি, আপনি আরও বেশি পরিমাণ ওভারড্রাফ্ট তো পেতেই পারেন...”

“কিন্তু আমার তো দশ লাখ টাকার জন্যই সিকিউরিটি দেওয়া আছে। আমার বাড়ি জমি ধরে ওরকমই তো একটা হিসেব করেছিলেন তখন। আমি তো নতুন করে আর কিছু...”

“প্রয়োজন নেই।” ম্যানেজার হাসছে, “ক্লায়েন্ট বুঝে সিকিউরিটির হেরফের করাই যায়। আপনি তো অলরেডি নিজেকে প্রমাণ করেছেন। জ়াস্ট একটা ফরমাল প্রেয়ার দিন, আমরা অ্যাপ্রুভ করে দেব। আপনারও ব্যাবসা বাড়ুক, সমবায় ব্যাঙ্কের ঘরেও দু’-চার পয়সা আসুক। চাইলে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটটাকে আরও বড় করতে পারেন। নতুন মেশিনারি কিনুন, হ্যান্ড আরও বাড়ান...”

শুনতে তো অহনার ভালই লাগছে। কারখানার শ্রীবৃদ্ধি ঘটলে মন্দ হয় না। ওই বাড়িটা আধাখ্যাঁচড়া অবস্থায় পড়ে আছে, বাকিটুকু নির্মাণ করে নিলে অনেকটা জায়গা বাড়ে। এখন স্টোররুমটা বড্ড

ছোট, ও দিকের বাড়তি ঢালাইয়ের নীচে স্বচ্ছন্দে একটা বড় ঘর উঠে যাবে। অফিসটারও কোনও সৌষ্ঠব নেই, লোকজন এলে বসতে দেওয়া যায় না, সাজিয়ে গুছিয়ে চেকনাই বাড়ালে আশাবরীরই ইজ্জত চড়বে। মাত্র সাতজনে অনেক দিন আটকে আছে সোলার ইউনিট, আশিটা ল্যাম্প ডেলিভারি দেওয়ার পর এবার তো প্রোডাকশন বাড়ানোর ব্যাপারটা ভাবাই উচিত। স্যার না বলেন, উঁহু, শুধু বলেই থেমে থাকেননি, হিসেব কষেও দেখিয়েছেন, ব্যাবসা ক্রমাগত না বাড়ার অর্থ আস্তে আস্তে কমে যাওয়া, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলা। সুতরাং আরও স্টাফ নিয়ে আশাবরীর কলেবর যদি হৃষ্টপুষ্ট হয়, তো সেটা নিশ্চয় খারাপ কিছু নয়।

কিন্তু কেন এসব করবে অহনা? ব্যাবসা বাড়ল, না কমল, তাতে সত্যিই কি অহনার কিছু যায় আসে? সে কি এক পা এক পা করে বিজনেস টাইকুন হওয়ার জন্য গড়েছিল আশাবরী? মোটেই না। বরং তার উদ্দেশ্যটাই তো ব্যর্থ। উদ্যম দূরে থাক, কাজেকর্মে আগ্রহই তো সে হারিয়ে ফেলেছে। আশাবরী এখন এমনই এক জেলখানা, যার পরিধি বাড়লে অহনার হয়তো আরও শ্বাস রোধ হয়ে যাবে। এখন তো আফশোস হয়, একটু মুক্ত বাতাস খুঁজতে এসে কেন যে সে এক বাঁধাধরা নিষ্প্রাণ গণ্ডিতে নিজেকে বেঁধে ফেলল? না, আর নয়, কোনও প্রলোভনের ফাঁদেই আর পড়বে না অহনা।

শুকনো হেসে অহনা বলল, “আপনাদের অফারের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার কোনও এক্সপ্যানশান প্রোগ্রাম নেই, আমি বাড়তি কোনও ঝুঁকি নিতেও চাই না।”

“কেন ম্যাডাম? আপনি একজন সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার। আমরা আপনার উদ্যোগের কত প্রশংসা করি...”

সফলতা আর ব্যর্থতা কি এত সহজে মাপা যায়? অহনা হাসল মনে মনে। আরও শুকনো গলায় বলল, “না ম্যানেজার সাহেব। এই মুহূর্তে ব্যাবসা বাড়ানোর আমার কোনও প্ল্যান নেই।”

“নো প্রবলেম। তবে অফারটা মাথায় রাখুন। ইউ আর অলওয়েজ় ওয়েলকাম।”

অহনা ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল। আকাশে আজ ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ঢাকনা। ফাঁকফোকর দিয়ে গলে আসা রোদ্দুরের তেজও যেন অনেকটা কম। গ্রীষ্মকালের এই সময়টায় পথেঘাটে বড় একটা ভিড় থাকে না। গতি বাড়িয়ে মোপেড চালাচ্ছিল অহনা। বেশি স্পিড ওঠে না অবশ্য। তিরিশ কিলোমিটার পেরোলেই থরথর কাঁপতে থাকে ইঞ্জিন। তবু এই বাহনটি অহনার বড় সাধের। বেশি জোরে ছুটতে পারে না বলেই কি? হয়তো। জোরে ছোটা যে কী ভয়ংকর নেশা, অহনা তা হাড়ে হাড়ে জানে।

ফিরে আজ আর অফিস নয়, সোজা বাড়ি। এবং যা ভয় পেয়েছিল তাই, কৃষ্ণা ভেগে গেছে। অর্ঘ্য বাইরের ঘরের সোফায় বসে দেরিতে আসা খবরের কাগজ পড়ছিল, সুসমাচারটি সেই দিল।

অহনা জিজ্ঞেস করল, “তুই কখন এলি?”

“এই তো দশ-পনেরো মিনিট হবে। তোমার ইলাদেবীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে ঢুকলাম।”

“অর্থাৎ খাওয়া হয়নি?”

“তোমার জন্যই ওয়েট করছি।”

“আমি এখন না ফিরলে? খেতিস না?”

“তা নয়...তবু...দুটো মানুষ বাড়িতে আছি...”

“বুঝেছি।...আয়, থালা লাগাচ্ছি।”

“তুমি স্নান করে এসো। আমার তেমন তাড়া নেই।”

“কেন রে? খিদে পায়নি?”

“সে এক কাণ্ড। এক বাড়িতে জল চাইলাম, মুড়ি বাতাসা নারকোল ধরিয়ে দিল। ঘরের ঢেকি ছাঁটা চালের মুড়ি... কী অপরূপ স্বাদ...”

“কোথায় এত আপ্যায়ন করল তোকে?”

“এই তো, ঈশ্বরপুরে।”

অহনা বিস্মিত স্বরে বলল, “তুই লাস্ট উইকেও ঈশ্বরপুর গেছিলি না?”

“হ্যাঁ...মানে....” অর্ঘ্য যেন সামান্য থতমত। তারপরই আলগা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “অনেক সময়েই এক গাঁয়ে একাধিক বার যেতে হয়।”

পালটা আর প্রশ্ন জুড়ল না অহনা। তবে মনে যেন একটা খচখচানি রয়েই গেল। স্নান সেরে এসে যখন খেতে বসল, তখনও খটকাটা যায়নি।

হঠাৎই অহনা জিজ্ঞেস করে ফেলল, “তোর কোশ্চেনেয়ারটা আমায় দেখাস তো।”

“কেন? কী করবে?”

“এমনি। কৌতূহল। কী ধরনের ডাটা কালেকশন করিস সেটাই একটু বুঝতে চাইছি।”

“আমরা সোশিও ইকনমিক ইনফর্মেশনই বেশি জোগাড় করি। সামাজিক নানান নিয়ম-কানুন সম্পর্কে কার কীরকম ভিউ তাও জানার চেষ্টা করি। যেমন ধরো, অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়া... ছেলে মেয়ে দু’জনকেই লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া নিয়ে কে কী ভাবছে... সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের পাস্ট হিস্ট্রিটাও জানার চেষ্টা...।” বলতে বলতে একটু থামল অর্ঘ্য, “আজ একটা বেশ ইন্টারেস্টিং তথ্য পেলাম। তুমি তো অনেক দিন এখানে আছ, নিশ্চয়ই তোমার নলেজে আছে...”

“কী বল তো?”

“পাশের ওই গ্রামটার নাম ঈশ্বরপুর কেন? কেনই বা এই গ্রামের নাম আলাইপুর?”

এমন কথা কোনও দিন মাথাতেই আসেনি অহনার। তাচ্ছিল্যের সুরে অহনা বলল, “ধুস, ওসব খবর আমি রাখি না।”

“রাখা উচিত। তুমি যাদের সঙ্গে আছ... যাদের নিয়ে কাজ করছ... তাদের তুমি ভাল করে চিনবে না?”

“জ্ঞান মারিস না। কী শুনলি সেটা বল।”

“তুমি কি জানো এক সময়ে এই গ্রামটার নাম আগে ছিল শিবনগর? আর ঈশ্বরপুর তখন মামুদপুর?”

“তা হবে। তো?”

“শিবনগরে তখন এক ঘরও মুসলমান ছিল না। আর মামুদপুর ছিল হান্ড্রেড পারসেন্ট মুসলিম ভিলেজ। এই শিবনগরে একটা বিখ্যাত শিবমন্দির ছিল। প্রত্যেক চৈত্র সংক্রান্তিতে সেখানে মেলা বসত।”

“মন্দির তো এখনও আছে। বাইরের চত্বরটায় চড়কের মেলাও বসে।”

“এটা সেই মন্দির নয়। আমার কথা শোনোই না।” অর্ঘ্য গলা ঝাড়ল, “দুই গাঁয়ে তখন একটা চাপা রেষারেষি ছিল। সেই সময়ে শিবনগরের এক ছেলে মামুদপুরের একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে। মেয়েটিকে নিয়ে সে পগার পার হয়ে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু পালানোর দিন মেয়ের বাবা সব জেনে যায়। অমনি মামুদপুরের সমস্ত জোয়ান-মদ্দ লাঠিসোঁটা নিয়ে হানা দেয় শিবনগরে। ওই শিবমন্দিরে মেয়েটাকে নিয়ে লুকিয়েছিল সেই তরুণ, টের পেয়ে মামুদপুরের লোকেরা মন্দিরটাই অ্যাটাক করে। মন্দিরের দরজা ভেঙে মেয়েটাকে উদ্ধার করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। ছেলেটাকে তারা মেরে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে শিবের মন্দিরটাকেও চুরমার করে দিয়ে যায়। শিবনগর প্রথমে খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল, তারপর তারাও দল বেঁধে চড়াও হল মামুদপুর। ব্যস, বেধে গেল লাঠালাঠি। মেয়েটিও খুন হল, মামুদপুরের মসজিদও গুঁড়িয়ে দেওয়া হল মাটিতে। তারপর থেকে দুই গাঁয়ের ভয়ংকর শত্রুতা। পরস্পরের আকচাআকচি এমন একটা আকার ধারণ করল, এ গ্রামের লোক ও গ্রামের লোককে একা পেলে জানে মেরে দিচ্ছে। রাতের অন্ধকারে গিয়ে এ ওর খেত জ্বালিয়ে দিচ্ছে, পুকুরে বিষ ঢেলে আসছে...। খুনোখুনি লাঠালাঠির ঠেলায় দু’ গাঁয়েই চাষবাস লাটে ওঠার দশা, সদাই কাজিয়া বাধার আতঙ্কে দু’পক্ষই সিঁটিয়ে থাকে। এমনই এক সময়ে সিরাজ সাঁইয়ের এক চেলা এসে হাজির হয়। কেউ বলে সে হিন্দু, কেউ বলে সে মুসলমান...”

অহনা বলল, “সিরাজ সাঁইয়ের নামটা তো খুব শোনা শোনা! লালন ফকিরের গুরু না?”

“হতে পারে, জিজ্ঞেস করিনি। তোমাদের এখানে কাছেই যেন কোথায় সতীমায়ের মেলা হয়, সেখানেই যাচ্ছিল সেই চ্যালাটি। দু’গাঁয়ের কোন্দলের কথা শুনে চলে আসে এখানে। গাঁয়ের মাথাদের ডেকে সে জিজ্ঞেস করে, এই লড়াই ঝগড়ায় কার কী লাভ হয়েছে এখনও পর্যন্ত। কারও মুখে বাক্যি নেই। অবশেষে সে মিটমাটের এক রাস্তা বাতলায়। বলে, দু’পক্ষকেই সাজা ভুগতে হবে, নইলে নাকি মনে জমে থাকা রাগ যাবে না। মুসলমানরা নিজের হাতে মন্দিরটা গড়ে দেবে আর মসজিদখানা বানাতে হবে হিন্দুদের। শুধু তাই নয়, আল্লার নামে শিবনগরের নাম হবে আলাইপুর, আর মামুদপুর হবে এখন থেকে ঈশ্বরপুর। নতমস্তকে সেই দরবেশের কথা সেদিন মেনে নিয়েছিল সবাই। আশ্চর্য ব্যাপার কী জানো, তারপর থেকে দুই গ্রামে একটি বারের তরেও আর বিবাদ বাধেনি।”

অর্ঘ্যর মুখে গাঁয়ের উপাখ্যান শুনতে বেশ আজব লাগছিল অহনার। কাহিনি শেষ হওয়ার পর বলল, “এসব গপ্পোও তোর সমীক্ষার কাজে লাগে নাকি?”

“তা একটু লাগে বই কী।” অর্ঘ্যকে যেন সামান্য আনমনা দেখাল, “এইসব গল্পকথা দিয়েই তো দেশের মানুষকে ভাল করে চেনা যায়।”

“বটে? তা আলাইপুর-ঈশ্বরপুর এপিসোড থেকে কী চিনলি?”

“মানুষ শান্তি চায়।” বিড়বিড় করে আবার বলল অর্ঘ্য, “মানুষ শান্তি চায়।”

একটু যেন থমথমে হয়ে গেছে অর্ঘ্যর মুখ। ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছে আঙুলগুলো। আপন মনে দোলাচ্ছে মাথা। অহনা যে সামনে বসে ড্যাবড্যাব চোখে দেখছে তাকে, তা যেন খেয়ালই নেই। হঠাৎ অর্ঘ্য এত ভাবিত হয়ে পড়ল কেন? অহনার মাথায় ঢুকছিল না। তবে আর কৌতূহলও দেখাল না। চুপচাপ খাওয়া শেষ করে থালা নিয়ে উঠে গেল রান্নাঘরে। আঁচিয়ে এসে বাড়তি খাবার তুলছে ফ্রিজে। নজরে পড়ল এখনও নিথর বসে আছে অর্ঘ্য।

এই অর্ঘ্য যেন অহনার একেবারেই অচেনা। হাসিখুশি রগুড়ে ছেলেটার সঙ্গে এই চিন্তামগ্ন যুবকের যেন আকাশ-পাতাল ফারাক। যেন কচি কচি নেই আর, দুম করে বেড়ে গেছে বয়সটা।

অহনা মৃদু স্বরে বলল, “এই, শেষ কর।”

যেন ঈষৎ চমকাল অর্ঘ্য। তারপর ঘাড় নামিয়ে মন দিয়েছে থালায়।

অহনা ঘরে যাচ্ছিল, কী ভেবে ঘুরে এল, “আবার বেরোবি নাকি?”

“উঁ?...হুঁ।”

“এবেলা বেশি দূরে যাস না। আকাশে মেঘ করছে। গুমোটও আছে। বিকেলের দিকে ঝড়বৃষ্টি নামতে পারে।”

অর্ঘ্য চোখ তুলে তাকাল। স্বর ফুটেছে। চিলতে হেসে বলল, “নয় একটু ভিজলামই।”

“থাক। ওই সব শখ বাড়ি গিয়ে মেটাস। হঠাৎ জ্বরটর বাধালে এখানে কে দেখবে, অ্যাঁ?”

“কেন, তুমি তো আছ।”

“আমার বুঝি কাজ নেই? ঘরে বসে তোর সেবা করলে চলবে?” অহনার স্বরে ছদ্ম কোপ, “সাফ বলে দিচ্ছি, পাকামি করে অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি কিন্তু স্রেফ ঘেটি ধরে বের করে দেব। তারপর রাস্তায় পড়ে থাকো, জাহান্নমে যাও, আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড।”

মজারু ভাবটা ফিরে এসেছে অর্ঘ্যর, “তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পারবে অণুদি? আমার ওপর?”

“আমি তো নিষ্ঠুরই।” আচমকা কোত্থেকে এক দলা ক্ষোভ ঠিকরে এল অহনার গলা থেকে, “সব্বাই তো আমাকে তাই বলে।”

অর্ঘ্য অপ্রস্তুত মুখে বলল, “আরে তুমি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ কেন? আমি তো মজা করছি।... ঠিক আছে, বৃষ্টির জল গায়েই লাগাব না। ফোঁটা পড়ার আগেই লক্ষ্মী ছেলের মতো প্যাভিলিয়ানে ফিরে আসব। খুশি?”

হাসতে চেষ্টা করল অহনা। সেভাবে ফুটল না হাসিটা। মন্থর পায়ে এল নিজের ঘরে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। দেখছে বিম্বিত অহনাকে। মনে মনে নিজেকে ধমকাচ্ছে কড়া গলায়। কেন যে হঠাৎ হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারায় স্নায়ু? তাই কি রুক্ষ কর্কশ ছাপ পড়ে যাচ্ছে মুখে? দেখতে সে কোনও কালেই রূপসি নয়, মেরেকেটে সুশ্রী বলা চলে, একফালি স্নিগ্ধ লাবণ্যও হয়তো ছিল একসময়। কিন্তু এখন তার লেশমাত্র আছে কি? চোয়াড়ে মার্কা রং জ্বলে যাওয়া মুখখানায় রাগ বিরক্তি নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কোনও অনুভূতিই যেন ফোটে না আজকাল। একটা মানুষকে ঘেন্না করে নিজেকেই কি আমূল বদলে ফেলল অহনা? অথচ সেই মানুষটা দিব্যি মজাসে আছে! থাকবেও। লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি চড়ছে। আর প্রেমের সুধায় অবগাহন করছে নিত্যদিন। হায় রে অহনা, তুই শুধু আশাবরীই কর আর দিনকে দিন কুত্সিত হ। ভেতরে বাইরে, সর্বাঙ্গে। অর্ঘ্যর মতো কচি সরল ছেলেটাও নিশ্চয়ই তোর চালচলন দেখে মনে মনে হাসছে।

নিজেকে খানিক গাল পেড়ে অহনা শুয়ে পড়ল বিছানায়। চোখ জড়িয়ে আসছিল, উঠল জোর করে। আজ বুধবার, মাইক্রো-ফিনান্সের মেয়েগুলোকে নিয়ে সপ্তাহের এই দিনটাতে বসে অহনা। গত সাত দিনের কাজের হিসেব নেয়, বানিয়ে দেয় আগামী সাত দিনের কর্মসূচি। সুতরাং ঘুমকে বিদায়, নেমে পড়ো পার্থিব লেনাদেনায়।

তার আগে সুশোভন স্যারকে একটা ফোন। ব্যাঙ্কের প্রস্তাবটা জানিয়ে রাখা উচিত। যাহ, আজও সুইচড অফ। হল কী স্যারের, সেই অর্ডার মেলার দিন থেকেই নিরুদ্দেশ। কোথাও গেছেন নাকি! খোঁজ নিতে হবে তো।

ঘর থেকে বেরোতেই চোখ পড়েছে অর্ঘ্যর কামরায়। দরজা আধখোলা, শয্যায় অর্ঘ্য উদাস শুয়ে, বুকের ওপর ল্যাপটপ। কী ভাবছে? হিসেব করছে কিছু?

নিঃশব্দে সরে যেতে গিয়েও অহনা ফিরে এসেছে। গলা খাকারি দিয়ে বলল, “শুনছিস?”

ল্যাপটপ সামলে অর্ঘ্য ঘুরে তাকিয়েছে, “বলছ কিছু?”

“হ্যাঁ।...বেরোনোর সময়ে চাবিটা আর অফিসে দিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।”

“তা হলে তুমি...? কৃষ্ণা...?”

“আমাদের কাছে এক সেট করে আছে। তুই কখন ঢুকিস, কখন বেরোস... ওটা তোর কাছেই থাক এখন।”

গ্রিলগেট খুলে ছোট্ট মাঠটুকু পেরিয়ে অহনা এল অফিসে। মায়া শান্তা দেবিকা, আশাবরী মাইক্রো-ফিনান্সের তিন সৈনিকই উপস্থিত। গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। কে কেমন আছে, জানারও আগ্রহ নেই অহনার, চেয়ারে বসেই টাকা সংগ্রহের হিসেব নিতে শুরু করেছে।

পাঁচটা মিনিটও কাটেনি, মোবাইল সরব। মনিটরে মাতৃদেবী।

সেলফোন কানে চেপে অহনা উঠে অফিসের বাইরেটায় গেল, “হ্যাঁ, বলো।”

“ঝুমারা তো এইমাত্র রওনা দিল। হাওড়া থেকে ট্রেন। সাড়ে পাঁচটায়।”

“বাহ, তুমি তো তা হলে এখন পুরোপুরি স্বাধীন। ফ্ল্যাটময় ঘুরে ঘুরে নাচো।”

“ধ্যাৎ! সারাটা দিন একা একা কী করে যে কাটবে!”

“এখানে কীভাবে কাটে? টিভি দেখা, কাগজ পড়া, গড়াগড়ি খাওয়া, বাগান করা... ওখানেও তো সবই মজুত। শুধু বাগানের বদলে টব। বাড়তি কাজও তো আছে একটা। ছেলের জন্য রোজ ভাল ভাল খাবার বানানো। ছেলের পছন্দসই মালাইকারি, চিতল মাছের মুইঠ্যা...।”

“লাল্টুর তেলমশলা খাওয়া বারণ হয়ে গেছে রে।”

“কেন, প্রেশার-টেশার ধরা পড়ল নাকি?”

“শুধু কি প্রেশার, কোলেস্টেরলও নাকি বেশ হাই। ঝুমা পইপই করে বলে দিয়েছে, আমি যেন ওকে রিচ কিছু না খাওয়াই।”

“তা হলে তো তোমার হাতে বেড়ি। মন দিয়ে স্টু-ই রাঁধো।”

“তোদের ও দিকের কী খবর? অর্ঘ্য এখন কোথায়?”

“ঘরে।”

“আর তুই?”

হয়তো নিছকই সরল জিজ্ঞাসা। তবু ঝাং করে চটে গেল অহনা। মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল, অর্ঘ্যর সঙ্গে লীলাখেলায় মেতে আছি। কোনওক্রমে সামলে নিয়ে বলল, “রোজ এই সময়ে যেখানে থাকি, ঠিক সেখানেই আছি।”

বাক্যের চোরা ঝাঁঝ বুঝি টের পেল না শেফালি। সহজ ভঙ্গিতে বলল, “আশাবরীতে? তা ভাল। আজ কৃষ্ণা কী রাঁধল?”

শেফালির প্রশ্নের শেষ নেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইছে ঘরদোরে ঠিকঠাক ঝাঁট পড়েছে কি না, কৃষ্ণা কখন এল, কতক্ষণ ছিল, ফিনাইল দিয়ে ঘর মুছেছে না স্রেফ ভিজে ন্যাতা বুলিয়েছে, বাগানে জল পড়েছে কি না, কে জল দিল, আকাশে রোদ না মেঘ, বৃষ্টি নামার আগে যেন মনে করে জানলা বন্ধ করা হয়...। অহনা ফোন যখন ছাড়ল, কান রীতিমতো গরম হয়ে গেছে।

অফিসে ফিরে ফের কাজ। শুনতে হচ্ছে নানান সমস্যার কথা। কোন স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে সদস্যদের মধ্যে মতের অমিল হচ্ছে, কারা টাকা দিতে টালবাহানা করছে, কী কী ব্যাবসার জন্য ঋণ দেওয়া এখন উচিত হবে না, এরকম অজস্র সাতসতেরো। তারই মাঝে হঠাৎ এক আবদার জুড়ল মায়া। ঝালকাঠি গ্রামের গামছার খুব সুনাম। যারা গামছা বোনে তাদের বাড়ির মেয়ে-বউরা একটি নতুন গোষ্ঠী গড়তে ইচ্ছুক, সবাই মিলে ধার নিয়ে একটা পাওয়ারলুম বসাতে চায়। মায়ার প্রবল বাসনা, তার ওপর যেন ছেড়ে দেওয়া হয় নয়া সেল্ফহেল্প গড়ার ভার। প্রস্তাবটা অহনা এক কথায় নাকচ করল না বটে, তবে এক্ষুনি অনুমতিও দিল না। কাঁধে বাড়তি জোয়াল নেওয়ার আগে অনেক কিছু খতিয়ে দেখার ব্যাপার

আছে। সে নিজে আগে সরেজমিন করবে, সবাইকে নিয়ে মিটিং ডাকবে, শেখাবে নিয়মকানুন। সময়ে টাকা ফেরত না দিলে কী হতে পারে তাই নিয়ে ভয় দেখানোটাও খুব জরুরি। তার পরেও যদি মেয়েগুলোর ইচ্ছে থাকে, তখন না হয়...। কোনওক্রমে কাটাতে পারলে অহনা তো বেঁচে যায়। তা বলে নিজের অনিচ্ছের ব্যাপারটা মেয়েগুলোকে টের না পেতে দেওয়াই ভাল। তাতে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের বড় ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

বিকেল থেকেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সূর্য ডুবতেই ঝাঁপিয়ে এসেছে বৃষ্টি। অর্ঘ্য বেআক্কেলেপনা করেনি, আলো থাকতে থাকতেই সেঁধিয়ে গেছে কুলায়।

সন্ধে থেকে টিভি গিলছে অর্ঘ্য। কৃষ্ণা রুটি করে চলে গেছে, অহনা একটু চাউমিন বানাচ্ছিল। রান্নায় তার মোটেই স্পৃহা নেই, অর্ঘ্যর জন্যই ঢুকেছে হেঁশেলে। একবার হালকা ভাবে মুখ ফুটে বলতেই যেভাবে হ্যাংলার মতো রাজি হয়ে গেল!

দু'হাতে দু'খানা প্লেট নিয়ে অহনা হাজির। স্বভাববিরুদ্ধ তরল স্বরে হাঁকছে, "খানা তৈয়ার, জলদি খাও। আওর লাগেগা তো নেহি মিলেগা।"

অর্ঘ্যর ভ্রূক্ষেপ নেই, টিভিতে একটা খবর দেখছে গভীর মনোযোগে। কোরাপুটের কাছে একদল সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে উগ্রপন্থী বাহিনীর লড়াই হয়েছে জোর। অতর্কিতে হানা দিয়েছিল উগ্রপন্থীরা, মারা গেছে বারোজন পুলিশ, আহতও হয়েছে উনিশজন। উগ্রপন্থীদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম, তাদের মাত্র চারজন কমরেডের মৃত্যু ঘটেছে, তিনজন ধরা পড়েছে অকুস্থলে।

দু'-দু'বার ডাকার পরেও সাড়া না পেয়ে অহনা বিরক্ত। গোমড়া গলায় বলল, "একই নিউজ কেন চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিস। এইসব মারামারি তোর ভাল লাগে?"

"এটা তো মারামারি নয়। এরা একটা আদর্শের জন্য লড়ছে?"

"কী জানি বাবা। মানুষ খুন কি কখনও আদর্শ হতে পারে?"

“যুদ্ধে মানুষ মরে না? যুদ্ধ কি খুন? ভাল কারণে যুদ্ধ কি হয় না? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে তোমরা তো ধর্মযুদ্ধই বলো?”

“অত বুঝি না। তবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিণামে কি শান্তি এসেছিল? খারাপরা হয়তো মরল, কিন্তু তাদের বাড়ির লোকরা? বউ-ছেলে-মেয়েরা? তাদের কী হাল হয়েছিল? এ ছাড়া আরও যে লাখো সৈনিক মরেছিল, তাদের প্রাণের দাম নেই? নাকি আদর্শ ধর্মযুদ্ধ এইসব ভারী ভারী কথার আড়ালে তাদের অস্তিত্বই মূল্যহীন হয়ে গেছে। তা ছাড়া যারা জিতেছিল, তারাই কি ভাল? অন্যায়যুদ্ধে একের পর এক যোদ্ধাকে মেরেছে...”

আচমকা ঝুপ করে টিভি বন্ধ করে দিল অর্ঘ্য। চাউমিনের প্লেট ছুঁলই না। উঠে ঢুকে গেল নিজের গলতায়।

অহনা থ। হঠাৎ হলটা কী অর্ঘ্যর? সে কি ভুলভাল কিছু বলল?

.

॥ ৬ ॥

অহনার সাইকেলখানা পাশে রেখে নদীর পাড়ে বসে ছিল অর্ঘ্য। সামনে একটা বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। ঘন সবুজে ভরা দ্বীপের আড়ালে একটু একটু করে মুখ লুকোচ্ছে সূর্য। শ্রান্ত আলো তাপ হারিয়ে স্তিমিত ক্রমশ। গাছ-গাছালি রং হারাচ্ছে। বহতা জলে মৃদু একটা ধ্বনি জাগছে বটে, তবে স্রোত বেশি নেই। ভালভাবে লক্ষ না করলে নদীতে এখন জোয়ার চলছে না ভাটা, ঠাহর করা মুশকিল।

বিকেলে আজ সেভাবে কোথাও যায়নি অর্ঘ্য। এমনিতেও যে সে খুব নিয়ম করে গ্রামে গ্রামে ঘুরছে, তা নয়। কাছেপিঠে কোথাও একটা গেল, কোনও একটা বাড়ির আঙিনায় ঢুকে পরিবারের কর্তা-গিন্নি-ছেলে-মেয়ে যাকে হাতের কাছে পেল তার সঙ্গেই আলাপ জমাল, তাদের সংসারের বিষয়েই হয়তো গল্পগাছা করল খানিকক্ষণ, তারপর ধীরেসুস্থে বেরিয়ে পড়ে আর একটা বাড়ির সন্ধানে। প্রায়

সর্বত্রই আশাবরীর পরিচয়টা দিতে হয় অবশ্য, নইলে অজানা অচেনা লোকের কাছে কেউ মুখ খুলতে চায় না বড় একটা। এভাবে পাঁচ-সাতটা বাড়ি ঘুরলেই দিব্যি বেলা কাবার। আর কোনও গপ্পোবাজের পাল্লায় পড়ে গেল তো অর্ঘ্যর পোয়া বারো। একজনেতেই হু হু কেটে যায় সময়। তাতেই যা মালমশলা জোটে, স্বচ্ছন্দে সে ম্যানেজ করে নেয় অহনাকে।

কিন্তু সেরকম কাউকে খুঁজে নিতেও তো ইচ্ছে করল না আজ। এলোমেলো সাইকেল চালাল খানিকক্ষণ, তিন-চারখানা গ্রাম পেরিয়ে একটা শানবাঁধানো পুকুরের ধাপিতে জলে পা ডুবিয়ে বসে রইল কিছুটা সময়। ঘাটে কয়েকজন মেয়ে বউ ছিল, তারা এমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল! গাঁ-গঞ্জের মানুষজন আর মোটেই গল্পের বইয়ে পড়া সরল গ্রামবাসীটি নেই, অপরিচিত কাউকে তারা সহজে বিশ্বাস করে না, এ সত্যিটা ক'দিনেই টের পেয়ে গেছে অর্ঘ্য। অগত্যা উঠে আসতেই হল, সাইকেল নিয়ে ফিরেই এল আলাইপুর। অস্থায়ী ডেরায় গিয়ে শুয়ে পড়লেই চলত, কিন্তু কেন যে নদীর পানেই ঘুরে গেল সাইকেলের মুখ?

অহনার কাছাকাছি থাকতে অর্ঘ্য কি অস্বচ্ছন্দবোধ করছে? হ্যাঁ, কিছুটা তো বটেই। ক'দিন ধরে এত বেশি প্রশ্ন করছে তার অণুদি! শুধু অর্ঘ্যর দৈনিক কাজ নিয়ে নয়, কখনও দিদি, কখনও আসানসোল, কখনও বা অর্ঘ্যর কলেজ ইউনিভার্সিটি জীবন...। বর্তমানকে ঢেকে, অতীতের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে একের পর এক জবাব দিয়ে যাওয়া যে কী দুরূহ! তাও সামাল দিতে পারে অর্ঘ্য, কিন্তু অণুদির মুড? তার থই পাওয়া বুঝি আরও কঠিন, অর্ঘ্যর পক্ষে বোধহয় অসম্ভব। এই ঠান্ডা, তো এই গরম। এই মোটামুটি হাসিখুশি, তো পর মুহূর্তে তোলা হাঁড়ি।

কাল সন্ধেবেলাই তো কী বিশ্রী কাণ্ডটাই না হল। পুরনো একটা উত্তম-সুচিত্রার সিনেমা হচ্ছিল টিভিতে। তেমন একটা মনোযোগ দিয়ে নয়, তবু দেখছিল অর্ঘ্য। পাশের সোফায় বসে অহনাও।

হঠাৎ অহনার প্রশ্ন, "হ্যাঁরে, তুই বিয়ে করবি না?"

অর্ঘ্য এড়ানোর ভঙ্গিতে বলেছিল, “ধুস স্টেডি জব কিছু করছি না... এখন ওসব ভাবনার কোনও মানে আছে?”

“গার্লফ্রেন্ড আছে নিশ্চয়ই? কবে তোর সময় হবে সেই প্রতীক্ষায়?”

“সরি। আমি ওসব লাইনে নেই।”

“বাজে বকিস না। তোর এত সুন্দর চেহারা, পেটে বিদ্যে গজগজ করছে, চেষ্টা করলেই সামনে ব্রাইট ফিউচার... কোনও মেয়ে তোকে দেখে পটেনি এ আমায় বিশ্বাস করতে হবে?”

“কোরো না বিশ্বাস। যা সত্যি তাই বলছি।”

“স্টুডেন্ট লাইফেও তোর কোনও মেয়ে বন্ধু ছিল না?”

“হ্যাঁ। অজস্র ছিল। তবে তুমি যা ভাবছ তেমন নয়। তারা স্রেফ বন্ধুই ছিল।”

“তুই কক্ষনও তাদের কারও ওপর অ্যাট্রাকশান ফিল করিসনি?”

“আমি তাদের সে চোখে দেখিইনি কখনও। সত্যি বলতে কী, প্রেম ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না। আমার মনে হয়, ও ব্যাপারটা যুক্তিবুদ্ধির একটা অসুখ। মগজের টেম্পোরারি ইনস্যানিটি।”

শুনে অহনার কী হিহি হাসি। অহনাকে এ ক’দিনে কখনও অমনটা হাসতে দেখেনি অর্ঘ্য। পরের মিনিটেই আচমকা সিরিয়াস। রাগরাগ গলায় বলল, “পাগলামি কি সাধে আসে, পাগল বানিয়ে ছাড়ে।” কথাটার মানে বুঝতে পারেনি অর্ঘ্য। ভ্যাবাচ্যাকা মুখে তাকিয়েছিল অহনার দিকে। অহনার তখন চোখ জ্বলছে। ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো ফুঁসে উঠল, “পুরুষমানুষ জাতটাই নেমকহারাম। আর মেয়েরা বোকার হদ্দ। ফাঁদে তারা পড়বেই।”

অর্ঘ্য নার্ভাস গলায় বলেছিল, “এসব কী বলছ? সব ছেলে খারাপ হবে কেন? মেয়েরাও মোটেই সবাই নির্বোধ নয়। এই তো, তুমিই কি কম ইন্টেলিজেন্ট লেডি? কীভাবে কতজনকে নিয়ে একটা এত বড় প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছ!”

পলকে অহনা আরও ক্ষিপ্ত, “কে চায় এসব চালাতে? যত্তসব রাবিশ।”

বলেই পুরো স্পিকটি নট। মুখে এমন কুলুপ এঁটে রইল, সামনে বসে থাকতে অর্ঘ্যর বুক দুরদুর। সেই অহনাই আবার এক ঘণ্টা পরে স্বাভাবিক স্বরে খেতে ডাকল, বাতচিত করছে টুকটাক...। অর্ঘ্য তো হতবাক। হঠাৎ হঠাৎ কী যে হয় অণুদির! অসুখী দাম্পত্যের কারণেই মনে এত ভাঙচুর!

হতে পারে। হতেও পারে। হতেই পারে।

তা অহনার ক্ষণভঙ্গুর মেজাজ মর্জিই কি এখন নদীতীরে ঠেলে পাঠিয়েছে অর্ঘ্যকে? খানিক তফাতে থাকবে বলেই কি বসে বসে ঢেউ গুনছে সে?

উঁহু, অর্ঘ্যর মনটাই আজ ভাল নেই। আজ কাকভোরে ফোন এসেছিল বাবার, তখন থেকেই। কাল বিকেলে আসানসোলের ফ্ল্যাটে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল মা, হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যায়, কোমরে জোর চোট পেয়েছে। কাঁধেও। তার চেয়েও বড় দুঃসংবাদ, মাথায় একটা বিশ্রী আঘাত লেগেছে। পড়ার পরে মা অচেতন হয়ে গিয়েছিল, হাসপাতালে গিয়ে জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু কারওকে চিনতে পারছে না। ডাক্তাররা সন্দেহ করছে, ব্রেন হেমারেজ। আগামীকাল স্ক্যান করা হবে, তারপর প্রয়োজন হলে অপারেশন।

সমাচারটা শোনার পর থেকেই অর্ঘ্য অস্থির অস্থির বোধ করছে। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ মানে তো এক ধরণের সেরিব্রাল স্ট্রোক। মা বাঁচবে তো? যদি বা প্রাণে রক্ষা পায়, প্রায় অচেতন ভেজিটেবল হয়ে যাবে না তো চিরতরে? যদি পরে আর সুযোগ না মেলে, চুপিচুপি একবার দেখে আসবে মাকে? বাবা অবশ্য বলল, ঝুঁকি নেওয়ার এক্ষুনি দরকার নেই, তবু...। বাবা তার অবস্থান জানে না, হয়তো ভাবছে খোকা এখনও মধ্যপ্রদেশ বা ছত্তিশগড়ের বনে বাদাড়ে বাস করছে। যেমন অহনারা জানে অর্ঘ্যর বাবা-মা এখন সিঙ্গাপুরে, তেমন বাবা-মাকেও অর্ঘ্য ওই রকমই একটা ধারণা দিয়ে রেখেছে কিনা। চরম প্রয়োজন ছাড়া এই নম্বরটায় ফোন করতেও তো নিষেধ করেছিল বাবাকে। তার পুরো পরিচয় সম্ভবত

এখনও পুলিশের খাতায় নেই, তবে আসানসোলের অর্ঘ্য রায় নিশ্চয় তাদের সন্দেহের তালিকার বাইরে নয়। সুতরাং মাকে দেখতে যাওয়া মানে বাবাকে বিপন্ন করা। উচিত হবে কি?

যুক্তিবুদ্ধির বাইরে গিয়ে অর্ঘ্য একটা বড়সড় শ্বাস ফেলল। উচিত আর অনুচিতের দ্বন্দ্ব কি অর্ঘ্যকে শোভা পায়? ক্লাস নাইনে চে গুয়েভারার জীবনীটা পড়ার দিনই কি তার বাকি জীবনটা কোন পথে গড়াবে, স্থির হয়ে যায়নি? সেই রাত থেকেই তো উচিত অনুচিতের বোধ একটা মাত্র নির্দিষ্ট অভিমুখে গড়িয়েছে। কলেজে পড়ার সময় যখন সে বাঁধাছকের বাইরের রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি শুরু করল, বাবা তো বটেই, মাও কি কম বাধা দিয়েছে? বলেনি, তুই কি চাস, তোর জন্য আমাদের কোমরে দড়ি পড়ুক? সে তখন বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর, আদৌ মূল্য দেয়নি তাদের আকুতিতে। সঠিক কাজই করেছে সে, কারণ বিপ্লব ওই ধরনের ব্যক্তিগত আবেগকে অনুচিতের লিস্টেই রাখে সর্বদা। এম-এ পরীক্ষার মুখে মুখে সে যখন চলে গেল ওড়িশায়, নয়াগড়ে পার্টির গোপন সম্মেলনে যোগ দিল, তখনই তো পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কটা সে মনে মনে ছিঁড়ে ফেলেছে। তারপর সে বাড়িতে আবার এসেছে ঠিকই, কয়েক বছর হয়তো বাসও করেছে মা বাবার সঙ্গে, কিন্তু ভবিষ্যতের ছবি তো তখন পরিষ্কার। গত আড়াই বছরে এক-দু’বারের বেশি মা-বাবার খোঁজ নেয়নি অর্ঘ্য, উচিত মনে করেছে বলেই নেয়নি, এবং তার জন্য অর্ঘ্যর মনে কোনও পাতিবুর্জোয়াসুলভ পাপবোধও নেই। তা হলে আজ কেন এই দোলাচল? কেনই বা মা’র বিষণ্ণ মুখখানা বারবার হানা দিচ্ছে চোখের পাতায়?

নাহ, এইসব জোলো অনুভূতিকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। মিছিমিছি মনকে দুর্বল করে লাভ আছে কোনও? বরং এখানে থাকতে থাকতেই ছকে নেওয়া দরকার, আগামী দিনে কী হবে তাদের কর্মপন্থা। পার্টি যে রাস্তা ধরেছে, সেটা কি অভ্রান্ত? শুধু অর্ঘ্য নয়, দলের অনেকের মনেই তো এখন সংশয়। রাজন, সৌরভ, গণেশন তো বলছে হয় স্টিয়ারিং ধরে গাড়ির মোড় ঘোরাও, নয়তো ঝাঁপ মেরে নেমে পড়ো, ক’জন মিলে অন্য একটা গাড়ি বানিয়ে নেব আমরা।

কিন্তু নতুন গাড়িটাও যে ভুল পথে যাবে না তার কী নিশ্চয়তা?

এতেও সেই দোলাচল? উফফ, কী যে করে অর্ঘ্য?

বসে থেকে থেকে হাঁটু ধরে গেছে। অর্ঘ্য উঠে দাঁড়াল। পাশেই এক কালীমন্দির, বেশ চকচকে চেহারা, মেঝেয় টাইলস, দিনের অন্তিম কিরণ মেখে নতুন রং করা দেওয়াল ঝকঝক করছে। ভালই ভিড়। আজ কোনও বিশেষ পুজোটুজো আছে নাকি?

তাকিয়ে থাকায় ব্যাঘাত ঘটল। নদীর ধার থেকে কে একজন ডাকছে। অর্ঘ্য এগিয়ে এল, "আমাকে বলছ কিছু?"

"হ্যাঁ কত্তা।" খাটো মলিন ধুতি পরা খালি গা লোকটা লজ্জা লজ্জা মুখে হাসছে, "তখন থেকে দেখছি, নদীর ধারে ঠায় বসে আছেন। আপনে বুঝি সিন সিনারি ভালবাসেন?"

"ওই আর কী।" হেসেই বলল অর্ঘ্য, "খারাপ লাগে না।"

"চলেন না কত্তা, একটু নৌকো বিহার করে আসবেন। নদী থেকে চারদিক আরও মনোহর লাগবে।"

"তোমার নৌকা আছে বুঝি?"

"এই তো। নীচেই পাড়ে বাঁধা একটা ডিঙি নৌকা দেখাল লোকটা," আসেন না কত্তা, "গরমকালের সাঁঝবেলায় নদীর হাওয়ায় মনটা তর হয়ে যাবে।"

বড্ড পীড়াপীড়ি করছে তো? সারাদিন ভাল রোজগারপাতি হয়নি সম্ভবত। অর্ঘ্য হেসে বলল, "তা নেবে কত?"

"সে আপনার যা প্রাণ চায়। আপনি হলেন গিয়ে আশাবরী দিদির অতিথি, একটু সেবা করার সুযোগ পেলেই ধন্য হই।"

বিনয়ের অবতার! চালাক লোক, দরাদরির মওকা দিল না। তবে অণুদি আর তার প্রতিষ্ঠান যে এই অঞ্চলে সমার্থক হয়ে উঠেছে তার আরও একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। বলতে হবে অণুদিকে। চটে না যায়!

ঘাট বলে কিছু নেই, ভাঙাচোরা পাড় বেয়েই সাবধানে নেমে অর্ঘ্য চড়েছে নৌকায়। পাটাতনে মেলে দিয়েছে পা। লোকটা বাঁশে বাঁধা দড়ি খুলে লগি দিয়ে চাড় দিল পাড়ে। দুলতে দুলতে সরে যাচ্ছে ডাঙা। বাড়ছে ছলাৎ ছল।

মসলিনের চাদর গায়ে জড়িয়ে আঁধার নামছে নদীতে। ভিজে ভিজে বাতাসে ভারী নরম একটা আমেজ। কাঁসর ঘণ্টা বাজছে মন্দিরে, আওয়াজ ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। আয়েসি সুখে মনটা সত্যিই তর হয়ে যাচ্ছিল অর্ঘ্যর।

আচমকাই মগজে হাতুড়ির ঘা। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে মা এখন পাঞ্জা লড়ছে মৃত্যুর সঙ্গে, আর সে কিনা নদীবক্ষে সান্ধ্যভ্রমণে বেঁচে থাকার মজা চাখছে তারিয়ে তারিয়ে!

পলকে উবে গেছে আনন্দ, ফের সেই বিস্বাদ অনুভূতি। তখনই মাঝির গলা পেল অর্ঘ্য “আরাম হচ্ছে না কত্তা। শরীর যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে, তাই না?”

প্রশ্নটা যেন পরিহাসের মতো বাজল অর্ঘ্যর কানে। জবাব দিল না, তেতো মুখে স্থলভূমির পানে তাকিয়ে আছে শুধু। একটু পরে সামান্য স্থিত হল মন। নৌকা সফর যাতে পুরোপুরি বৃথা না যায়, কেজো কৌতূহলে ব্যস্ত করতে চাইল নিজেকে। ফিনফিনে অন্ধকারমাখা মায়াবী চরাচর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বলল, “তোমার নামটা কী, ভাই?”

“আজ্ঞে, দুলাল।” লোকটা ঘাড় ফেরাল, “দুলাল দাস।”

“নৌকাটি কি তোমার?”

“আজ্ঞে। গত সনে বলাগড় থেকে বানিয়েছি। খুব মজবুত কাঠ। অন্তত দশ বছর টিকবে।”

“এই মাঝিগিরি করে বুঝি পেট চলে?”

“আমি তো মাঝি নই কত্তা। এ তো মাছের নৌকো। জাল ফেলে নদীতে মাছ ধরি।”

“তা পাও মাছ? শুনি নদীতে আজকাল মাছ নাকি খুব কমে গেছে?”

“হ্যাঁ কত্তা। এত ভুটভুটি চলে হরদম! পোড়া ডিজেলে মাছেদের বংশ নাশ হয়ে যাচ্ছে। এই তো মা ভাগীরথীর জলে, আগে বহরমপুর পর্যন্ত ইলিশ মিলত, এখন আর তেনাদের ঝাঁক নৈহাটি পেরিয়ে আসেই না।” লোকটা মেশিনের মতো দাঁড় টানছে দু’হাতে। ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, “তারপর ধরুন জল তো অনেক কমে গেছে। চোখের সামনে কত যে চর গজিয়ে উঠল। সান্যালের চর, কালিগঞ্জের চর... এই তো সামনেই কেমন একটা গজিয়েছে, এখনও নাম দেয়নি কেউ, তবে এরই মধ্যে সবুজে সবুজ। যে পারছে গিয়ে চাষবাস শুরু করে দিচ্ছে।”

“তুমিও ওখানে চাষ করো নাকি?”

“না কত্তা, জমিজিরেতের কাজ আমার আসে না। বংশের পেশাতেই টিকে আছি কোনওমতে। আর আপনাদের মতো লোকজন জুটে গেলে দুটো বাড়তি পয়সা হাতে আসে।”

“তা লেখাপড়া করেছ কদ্দূর?”

“পেরাইমারির পাশটা দিয়েছিলাম। তারপর বাবা ঘেঁটি ধরে নৌকোয় নিয়ে এল। বলল, ঢের বিদ্যে হয়েছে, এবার মাছ মেরে পেটের জোগাড় করো।”

চিনদেশের সেই মহান বিপ্লবীর কথাটা মনে পড়ে গেল অর্ঘ্যর। মাটির সঙ্গে যাদের নিবিড় যোগ, তাদের আগে চেনো জানো, তাদের থেকে শিক্ষা নিয়ে তৈরি করো বিপ্লবী চেতনা। দুলালও তো সেরকমই একজন, নয় কি?

উৎসাহ নিয়ে অর্ঘ্য জিজ্ঞেস করল, “তা দুলালভাই, পড়াশোনা যে করতে পারলে না, তার জন্য আফশোস হয় না?”

“কী হত লেখাপড়া শিখে?” দুলাল দাঁড় টানা থামিয়ে অবাক চোখে তাকাল, “আমি কি আপনাদের মতো প্যান্টশার্ট পরে অফিস যেতাম? মাঝখান থেকে ছেলের মতো দশা হত আমার।”

“তোমার ছেলে? কেন তার কী হয়েছে?”

“সে আর বলবেন না কর্তা। তাকে ইস্কুলে পাঠালাম, খেয়ে না খেয়ে মাস্টার রাখলাম, তিনিই ঠেলে গড়িয়ে স্কুল পার করে দিলেন, কলেজে ভরতি হল ছেলে। তবে কলেজের দরজা আর পেরোতে পারল না, ইতি হয়ে গেছে পড়াশোনায়। লাভের মধ্যে লাভ, জাল ফেলে মাছ ধরার বৃত্তিতে সে আর আসতেই রাজি নয়। নদীতে জাল ছুড়ছে, ভাবতেই নাকি তার মানে লাগে। এদিকে চাকরি জোটানোরও মুরোদ নেই। কিন্তু সারাক্ষণ কানে মোবাইল গোঁজার অভ্যেসটি ধরে গেছে বাবুর। পয়সার ধান্দায় এখন পার্টির বাবুদের পেছনে ল্যাং ল্যাং করছে।”

“কোন পার্টি করে তোমার ছেলে?”

দুলাল কেমন যেন সন্দিগ্ধ চোখে অর্ঘ্যর দিকে তাকাল। তারপর ফের সক্রিয় হয়েছে তার দু’কাঁধ। দাঁড়ে জল কাটতে কাটতে বলল, “সরকারি দলের সঙ্গেই থাকে আর কী।”

“মানে এখন যারা সরকারে আছে?”

“আগের সরকারের সঙ্গেও ছিল।”

“মানে লাল থেকে তেরঙা? ডিগবাজি?”

দুলাল এবার ধূর্তের মতো হাসছে, “আমাদের গরিব ঘরের ছেলেদের কি পতাকার রং দেখলে চলে? সরকারে যে আছে তার সঙ্গে থাকলে তাও দুটো-চারটে পয়সা ঘরে আসে।”

“সরকারের ডোল মেলে বুঝি? মানে সাহায্য?”

“সাহায্য বলেন সাহায্য, ভিক্ষে বলেন ভিক্ষে... সে আপনি যে নামই দ্যান... খুদকুড়ো মেলে বই কী। দেড়শো টাকা রোজে বছরে অন্তত ষাট সত্তর দিন। পুকুর কাটার কাজ, রাস্তা সারানোর কাজ...। তাও অর্ধেক দিন যেতে হয় না। কার্ডে সই করে দিলেই রোজের অর্ধেক হাতে গুঁজে দেয় দাদারা।”

“এটা তো দুর্নীতি। কাজ করো, পুরো পয়সা নাও। এইসব দু’নম্বরিকে তোমরা প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন?”

“ছাড়েন কত্তা। যা জোটে তাই কম কী। যারা সরকার গড়ে, তাদের অনেক খরচ-খরচা আছে না? তারা নিজেদের ভাগ নেবে না?”

আশ্চর্য, চলে আসা সিস্টেমটার সর্বাঙ্গে ঘূণ ধরে গেছে, গরিব মানুষের রক্ত চুষছে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো, তবু এই দুলালদের কোনও হেলদোল নেই?

অর্ঘ্য সামান্য বিরক্ত স্বরে বলল, “কিন্তু তোমাদের টাকা হাতিয়ে নেওয়া যে এক ধরনের চুরি, এটা তো মানো?”

“যেতে দ্যান কত্তা। আমাদের কি কিছু করার আছে?”

“কে বলল নেই? তোমরা যদি সবাই মিলে প্রতিবাদ করো, গর্জে ওঠো...”

“কী হবে তাতে? বড়জোর সরকার বদলে যাবে। কিন্তু যারা আসবে, তারা কি সগ্গোভোস্টো দেবতা? আসবে তো নরেনবাবুর বদলে হরেনবাবু। দেবেনের জায়গায় খগেন। আমাদের তাতে বাড়তি কী সুসার?”

“যদি এরকম কারওকেই না আনো...”

“মানে? তা হয় নাকি? কাউকে না কাউকে তো আসতেই হবে। সরকার গড়তেই হবে।”

ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনা বোধ করছিল অর্ঘ্য। পার্টির অন্দরে তত্ত্ব আলোচনা অনেক করেছে, কিন্তু পার্টির নিয়মেই তাকে বাস করতে হয়েছে প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে। কচিৎ কখনও মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় কিংবা ঝাড়খণ্ডের আধা শহরে পা রাখলেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অনুমতি ছিল

না, ভাষার ব্যবধানও ছিল দুস্তর। আলাইপুরে এসে সে প্রথম নিজের মতো করে কথাবার্তা বলতে পারছে সমাজের হ্যাভনটদের সঙ্গে। এদের মাঝে কি পার্টির ভাবনাকে চারিয়ে দেওয়া যায় না? অর্ঘ্য জোরে একটা শ্বাস টেনে বলল, "ধরো, সরকার ব্যাপারটাকেই যদি উত্খাত করে ফেলা যায়? যেখানে যে পার্টির যত বদলোক আছে সবাইকে নিকেশ করে ফেলা হল? অকারণে উত্পাত করার পুলিশ নেই, ঘুঘুর বাসা পঞ্চায়েত নেই, ঘুষখোর সরকারি অফিস নেই... সমস্ত ক্ষমতা চলে এল তোমাদের হাতে..."

"মানে?"

"তোমরা তখন নিজেরাই সরকার হয়ে গেলে। নিজেদের মতো করে কাজ করছ, দরকার মতো পয়সা পাচ্ছ..."

"কে দেবে?"

"নিজেরাই। ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবে।"

"তা হয় নাকি? কী যে আজব বাক্যি কন কত্তা! সরকারটাই বেবাক উধাও হয়ে যাবে? কে সরাবে তাদের?"

"বললাম তো, তোমরা। বন্দুক চালানো শিখবে, তাদের সঙ্গে লড়াই করবে..."

"আমরা...? লড়াই...?"

"আহা, তোমরা সবাই কেন? তার জন্য লোক আছে। তোমাদের হয়ে তারাই লড়বে। তোমরাও তাদের সঙ্গে থাকবে।"

"বুঝেছি। তারাই তখন সরকার হবে। তাই তো?" দুলাল বুঝদারের মতো মাথা দোলাচ্ছে, "এখন যেমন লাল-তেরঙ্গা, তখন তারাই হবে আমাদের প্রভু।"

"না মানে...তুমি ঠিক..."

“বললাম তো কত্তা। বুঝে গেছি।” দুলাল আপনমনে বিড়বিড় করছে, “ঠিকই তো। এদের যদি কেউ লড়ে হঠায়, গদি তো তাদের হকের পাওনা। কিন্তু যাই বলেন কত্তা, আমরা যেমন আছি তেমনই থাকব। মনিব বদলালে কি গরিবের কপাল বদলায়?”

যাহ, দুলাল তো বিশাল ব্যাপারটা উপলব্ধিই করতে পারছে না! অর্ঘ্যদের মহান তত্ত্বে পৃথিবীর চেহারাই যে অন্য রকম হয়ে যাবে, এ যেন গেঁয়ো জেলেটা কিছুতেই মানতে রাজি নয়!

মরিয়া হয়ে অর্ঘ্য বলল, “তোমাদের অত কিছু ভাবতে হবে না। শুধু বন্দুকটা কাঁধে তুলে নাও। নিদেনপক্ষে যারা লড়বে, তাদের পাশে পাশে থাকো।”

“কী দরকার কত্তা লড়াই কাজিয়ায়? এই তো বেশ আছি। যেভাবে যেটুকু, জুটুক, শান্তিতে থাকলেই যথেষ্ট। খুনোখুনি রক্তারক্তি ভাল লাগে না কর্তা। দুনিয়ায় কে কার শত্রু বলেন? পঞ্চায়েত প্রধানই হোক কী, মন্ত্রীই হোক, কী আমার অকালকুষ্মাণ্ড ব্যাটাই হোক, মরলে তো সবাই সমান। যে ক’টা দিন দুনিয়ায় আছি, সবাই মিলে ভাব-ভালবাসা করে থাকলে তো ল্যাটা চুকে যায়।”

“এ কী অদ্ভুত দর্শন? দুলাল যা বলছে তা কি শুধু দুলালেরই কথা? নাকি দেশের গড়পড়তা মানুষ এরকমই ভাবে? এরা কি তবে শ্রেণিসংঘর্ষের আদর্শকে মন থেকেই বিশ্বাস করে না। শোধনবাদী শ্রেণিসমন্বয়ের ধারণা কি এদের রক্তেই মিশে আছে?”

কিংবা এমন নয় তো, ভারী ভারী তত্ত্বগুলোই আদতে ফালতু? মানুষ কোনও তত্ত্বেরই দাস নয়। অতীতেও ছিল না। ভবিষ্যতেও হবে না। শুধু তারা, অর্ঘ্যরাই তত্ত্বের ভারে দূষিত করে ফেলছে পৃথিবীটাকে?

কথাগুলো মনে আসতেই অর্ঘ্য থরথর কেঁপে উঠল। এ কী প্রতিবিপ্লবী চিন্তা মনের কোণে উঁকি দেয় আজ? তার এতগুলো বছর কি তা হলে মিথ্যে? একটা কল্পদুনিয়ার দিকে অন্ধের মতো ছুটেছে নাকি সে?

নৌকো ক্রমশ ফিরছে পাড়ের দিকে। আস্তে আস্তে বাড়ছে কালীমন্দিরের কাঁসরঘণ্টার আওয়াজ। বাড়িঘরের টিমটিম আলোর দ্যুতি উজ্জ্বল এখন।

দুলালকে একখানা একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে অর্ঘ্য নেমে এল। ক্ষণিক দেখল অন্ধকার গঙ্গা, চোখ বুজে শুনল নদীর কলকল। তারপর সাইকেলটা নিয়ে ফিরছে। চড়ল না আর, হাঁটছে শিথিল পায়ে। আলাইপুরে এসে আজ পর্যন্ত যত বাড়িতে গেছে, দুলালের সঙ্গে মেলাচ্ছে তাদের কথাবার্তা। না, নিজের আদর্শের কথা তাদের কারওকে বলেনি। তবু কেন যেন মনে হয় সকলেরই সুর এক তারে বাঁধা। বেশি কিছু তাদের আকাঙ্খা নেই, দুলালের মতো তারাও যেন শুধু শান্তি চায়।

উঁহু, ভাবনাটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতেই হচ্ছে। অর্ঘ্য দাঁড়িয়ে পড়ল। মোবাইল হাতে নিয়ে মনে করে করে টিপল একটা নম্বর।

বাজছে ওপারে। ধরেছে। রাজনের গলা।

ইংরিজিতে রাজন বলল, “তুমি এখন কোথায়?”

নিষিদ্ধ প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গেল অর্ঘ্য। বলল, “আমার একটা কথা ছিল। আমাদের প্ল্যান অফ অ্যাকশন নিয়ে আমরা প্রচুর সময় ব্যয় করি, কিন্তু সাধারণ মানুষের মনোভাব আমরা খেয়াল করছি কি? আমাদের প্রতি?”

“স্টপ ইয়োর ননসেন্স। তেজস তোমায় পাগলের মতো খুঁজছে। কোরাপুট অপারেশন সফল হয়েছে, দেখেছ নিশ্চয়ই?”

“মৃত্যুর অনুপাত হিসেব করলে সফলই বলা যায়।”

“না। সব দিক দিয়েই সাকসেসফুল। গোটা এলাকা এখন আতঙ্কে কাঁপছে। প্রশাসন চরম হেনস্থা হয়েছে। কিন্তু এই জয়ের পর তেজস দলের সর্বময় ক্ষমতা চায়। ও মনে করছে তুমি তার প্রধান বাধা। আমাকে ফোন করেছিল তেজস। বলছিল অর্ঘ্য একজন রেনিগেড, জলদি জলদি ওর সন্ধান চাই।”

“লোকেশন জানানোর তো নিয়ম নেই।”

“আমিও তাই বলেছি। ও আমায় প্রোভোক করে বলল, তুমি নাকি ঝাড়গ্রাম থেকে কলকাতামুখো ট্রেনে উঠেছ। আমাকে এও শাসাল, তোমার মোবাইল টাওয়ার থেকে তোমায় লোকেট করবে। মনে হল ফাঁকা আওয়াজ নয়, সিরিয়াসলি চেষ্টা করছে।”

“কেয়ার করি না। আমি এখন কয়েকটা আদর্শগত প্রশ্ন নিয়ে...”

“পরে কথা হবে।” রাজন মাঝপথে অর্ঘ্যকে থামিয়ে দিল, “ফোনটা আপাতত বন্ধ রাখো। চটপট সিম বদলাও।”

লাইন কেটে গেল। হতবুদ্ধির মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অর্ঘ্য পা চালিয়েছে। আশাবরীর গেট পেরিয়ে একটু থমকাল। বাড়ি অন্ধকার। অফিসে আলো জ্বলছে। এখনও কাজ করছে অণুদি? কাজে নাকি অণুদির প্রবল অনীহা?

নাহ মানুষকে চেনা মুশকিল। অজস্র দিনরাতের সঙ্গী এক সময়ের হরিহর আত্মা তেজসকে চিনতে পারেনি অর্ঘ্য। কালোকুলো আধবুড়ো অভাব অনটনে জর্জরিত দুলালকেও কি চেনা গেল ঠিকঠাক? আর ক্যালিডোস্কোপের কুচি কুচি পাথরের মতো রং বদলে যাওয়া ওই নারী তো তার অচেনাই। একটা গরম শ্বাস অর্ঘ্যর পাঁজর ঠেলে উঠে এল। সে নিজেও কি এই মুহূর্তে অচেনা নয়? নিজের কাছেই?

.

॥ ৭ ॥

ঝালকাঠি থেকে ফিরছিল অহনা। পিছনে মায়াকে নিয়ে। অবিরাম বকর বকর করে চলেছে মায়া, কিছু শুনছিল অহনা, বেশির ভাগটাই তুলছে না কানে। মগজে চিন্তা গজগজ করছে যে। তাঁতিপাড়ার মেয়েগুলো ছাড়ল না কিছুতেই। ঋণ নাকি তাদের এক্ষুনি প্রয়োজন, দলবেঁধে নিতে পারলেই নাকি

তাদের সুবিধে, সুতরাং স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়া ছাড়া তাদের নাকি উপায় নেই। এদিকে ঝামেলা বাড়ল অহনার। এককাঁড়ি কাগজ তৈরি করো, সরকারি দপ্তরে নতুন গোষ্ঠীর নাম জানাও, মোট কতজন আছে, কে কে আছে তার তালিকা পাঠাও...। সব কাজ একা হাতে করতে হবে। এমনকী সরকারি দপ্তরে হাতে করে দিয়েও আসতে হবে চিঠিগুলো। পোস্টে পাঠালে বেমালুম অস্বীকার করবে হয়তো। কম বখেড়া!

মায়ার প্রশ্ন ঠিকরে এল, "ম্যাডাম, কী নাম ঠিক হল তা হলে?"

"ওরা যা বলেছে তাই। তাঁতিয়া।"

"কেমন যেন শোনাচ্ছে না! কিছু একটা শ্রী ফি দিয়ে নাম হলে ভাল হত। গৃহশ্রী, তন্তুশ্রী, গোছের..."

"আমাদের তো পাকামি করার দরকার নেই। ওদের ব্যাপার ওদেরই বুঝতে দাও।"

"এরা কবে থেকে লোন পাবে ম্যাডাম? মানে আমাকে আলাদা ডেকে জিজ্ঞেস করছিল কিনা..."

প্রশ্নটা মায়া কেন করল অহনা ভাল মতোই জানে। ধার না পেলে ধার শোধ শুরু হবে না, আর দেনা যখন শুধবে, তখনই তো মায়াদের আসল রোজগার। ঘরে গিয়ে টাকাটা নিয়ে আসে বলে প্রতি একশোয় আট টাকা করে দিতে হয় মেয়ে বউদের। তার অর্ধেক আশাবরীর প্রাপ্য, বাকি অর্ধেক পায় মায়ারা। কমিশনের ওই বাড়তি টাকাটা আছে বলেই না মাত্র দেড় হাজার মাইনে পেয়েও মাসভর উদয়াস্ত খাটে এরা।

তবু মায়ার এই হাঁকপাকানিটা অহনার পছন্দ হল না। কেঠো গলায় বলল, "এক্ষুনি এক্ষুনি হবে না। কলকাতায় যাই, গভর্নমেন্টের খাতায় এদের নাম তুলে দিয়ে আসি, তারপর।"

"গর্ভমেন্ট তো তখন তাঁতিয়ার জন্য আশাবরীকে একটা টাকাও দেবে, তাই না?"

অহনা এবার একটু বিরক্তই হল। কোত্থেকে কী শুনেছে কে জানে, মায়া শান্তা দেবিকাদের মনে ধারণা জন্মেছে, স্বনিভর্র গোষ্ঠীগুলোর দৌলতে বিস্তর টাকা পায় অহনা। আদতে মোটেই তো তা নয়। সরকার

তো দেয় মাত্র একবার। গোষ্ঠী পিছু দশ হাজার। সেই টাকাও আসে চার-পাঁচ দফায়। নাম পাঠানোর পরে কিছু দিল, টাকা ধার নিয়ে কাজ শুরু হল, তখন কিছু দিল...। এভাবেই খেপে খেপে দু'-তিন হাজার করে...। প্রতিবারই কাগজ পাঠাতে হয় গাদাগুচ্ছের। টাকার গন্ধ পেয়েই নাচে মেয়েরা, অহনার এ ঝঞ্ঝাটগুলো থোড়ি বোঝে।

অহনা গম্ভীর মুখে বলল, "ফালতু কৌতূহল কমাও। নিজের কাজ মন দিয়ে করো। মাথায় রেখো, আশাবরী তার কর্মচারীদের কখনও প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে না।"

"আমি কি তাই বলেছি?"

"ভবিষ্যতেও বোলো না। আশাবরী সরকারের কাছ থেকে কী পায়, কেন পায়, কিছুই যখন জানো না, আজেবাজে চিন্তাও মাথায় এনো না।"

বকুনিতে কাজ হল। চুপ মেরে গেছে মায়া। গণেশপোতার মুখটায় নেমে গেল। বাড়ি যাবে সোজা। দুপুর গড়াচ্ছে বিকেলের দিকে। পথে জীবনবাবুর দোকান খুলে গেছে, টুকিটাকি জলখাবারের সরঞ্জাম কিনল অহনা। পাঁউরুটি ডিম মাখন...। এক প্যাকেট চানাচুরও নিল, খানিকটা চিঁড়েও। মা থাকলে এসব নিয়ে ভাবতে হয় না, নিজেই হাঁটতে হাঁটতে এসে কিনে নিয়ে যায়। সে একা থাকলেও সমস্যা নেই, স্রেফ মুড়ি বিস্কুটেই চালিয়ে নিতে পারে এক দু' সপ্তাহ। অর্ঘ্য রয়েছে বলেই না এসবের বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে, রোজ রোজ তো থোড়-বড়ি-খাড়া খাওয়ানো যায় না। তাও কপাল ভাল, চেনা লোক, মাছটা সবজিটা বাড়িতে এসে দিয়ে যায়, নইলে তো অহনাকে রোজ ছুটতে হত বাজারে।

আশাবরীর কম্পাউন্ডে ঢুকে মৃদু চমক। অফিসের সামনে দু'-দু'খানা গাবদা মোটরবাইক। কে এল রে বাবা?

জিনিসগুলো বাড়িতে রেখে আসবে ভেবেছিল অহনা, সামান্য দোনামোনা করে আগে অফিসেই এল। দেখল, এসেছে মোট তিনজন। এক মধ্যবয়সি আর এক বছর তিরিশের গাঁট্টাগোট্টা অফিসঘরে

আসীন। তিন নম্বরটি একেবারে ছোকরা, মেরেকেটে একুশ-বাইশ, পাশের ঘরের দরজায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করছে মেয়েদের কাজকর্ম।

অহনার আগমনে উঠে দাঁড়িয়েছে গাঁট্টাগোট্টা। ঝুঁকে অহনাকে নমস্কার করে পাশের মধ্যবয়সিকে দেখিয়ে বলল, “দাদাকে চেনেন নিশ্চয়?”

“না, মানে...” অহনা সামান্য কুণ্ঠিতভাবে বলল, “আমি তো এখানে তেমন একটা কাউকে... কাজে এমন আটকে থাকি...”

“অত কিন্তু কিন্তু করছেন কেন?” এবার মধ্যবয়সি নড়েচড়ে বসল, “আমরা তো জানি আপনার কর্মকাণ্ড কত সুদূর অবধি বিস্তৃত। আপনার নিরলস নিঃস্বার্থ সেবা পেয়ে ধন্য হয়েছে টিয়াডাঙার আপামর জনগণ। আমরা যে আপনাকে চিনি, এই তো আমাদের পরম সৌভাগ্য।”

কী বলছে রে বাবা! অহনা মহান কিছু করেছে বলে তো মনে হয় না। বরং অর্ঘ্য সেদিন যা বলছিল, সেটাই তো সত্যির অনেক কাছাকাছি। মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য চটজলদি ধারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে বটে, কিন্তু প্রাথমিক সার্ভিস চার্জ, প্রসেসিং ফি, বাড়ি বয়ে টাকা পৌঁছে দেওয়া, বাড়ি গিয়ে মাস মাস কিস্তি সংগ্রহ বাবদ যা নেয়, সব মিলিয়ে সুদের হার গ্রামীণ কুসীদজীবীদের চেয়ে বেশিই হয়, কম তো কিছুতেই নয়। তারপরও কেউ এমন বিশেষণ ঝাড়লে মোটেই গর্ব হয় না, উলটে ধন্দ জাগে মনে।

মধ্যবয়সিটির ওজনদার ভাষণ শুনে গাঁট্টাগোট্টা কিন্তু মোহিত। জুলজুল চোখে দাদাটিকে দেখতে দেখতে অহনাকে বলল, “ইনি তারক মজুমদার। আমাদের টিয়াডাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সত্যেন্দ্র আচার্যের একান্ত কাছের লোক।”

অহনা দু’-এক সেকেন্ড ভেবে পেল না, এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত। তারপরই বাস্তববোধ ফিরেছে। নরম হেসে বলল, “ওয়েলকাম টু আশাবরী। বলুন কী খাবেন? চা না কফি? বাইরে থেকে আনতে হবে না, আমার মেয়েরাই বানিয়ে দেবে।”

“যা খুশি। তবে বিকেলের দিকে... কফি হলেই ভাল।”

বিকেলের সঙ্গে কফির কী সম্পর্ক, অহনার মাথায় ঢুকল না। তবে এঁদের যে তুরন্ত আপ্যায়ন প্রয়োজন, এটুকু বুদ্ধি অহনার ঘটে আছে। উঠে গিয়ে ইলাকে বলে এল কফির সঙ্গে যেন বিস্কুট ফিস্কুটও দেওয়া হয়। অফিসঘরে যখন ফিরল, মধ্যবয়সি আর গাঁট্টাগোট্টা অনুচ্চস্বরে কী যেন আলোচনা করছে। অহনাকে দেখেই ঝুপ করে থেমে গেল দু’জনে।

অহনা অস্বস্তিবোধ করল। এমনিতেই রাজনীতির লোকদের সে এড়িয়ে চলে প্রাণপণ, কিন্তু ঘরের মধ্যে এসে গেলে সে তো নাচার। এদের আজ মতলব একটা আছে নিশ্চয়। কায়দা না মেরে চটপট ঝেড়ে কাশুক না।

মুখে অহনা বলল, “আশাবরীর কাজকর্ম দেখতে এসেছেন বুঝি?”

“না না, আমরা তো সব জানিই।” ফের খোনাখোনা গলা বেজে উঠল, “আর জানি বলেই তো...”

“এম এল এ সাহেব আমাদের পাঠালেন। বললেন, জিজ্ঞেস করে এসো ওঁকে আমরা কীভাবে হেল্প করতে পারি।”

“ভাষাটা ঠিক কর গদা।” তারক মৃদু ধমক দিল, “সত্যেনদা বললেন, ওঁর কী কী লাগবে দেখে এসো।”

“অনেক ধন্যবাদ। মাননীয় এম এল এ সাহেবকে আমার নমস্কার জানাবেন।” অহনা সৌজন্যের সুরে বলল, “তবে আমার ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান... মোটামুটি তো চলেই যাচ্ছে।”

“তা বললে হয় নাকি? বিধায়ক মশাই আপনার জন্য ফান্ড অ্যালট করবেন বলে বসে আছেন।”

সংশয়ের মাত্রাটা বেড়ে গেল অহনার। তবু বিনীত স্বরে বলল, “আমি একা মানুষ, এই যা করছি, আমার পক্ষে যথেষ্ট। বেশি বড় করতে গেলে আমার সাধ্যের বাইরে চলে যাবে।”

“আপনার এই বিল্ডিংটা তো আপনি কমপ্লিট করে নিতেই পারেন ম্যাডাম।” গদাধ্বনি শোনা গেল। গলা চড়িয়ে বলল, “অ্যাই শাঁটুল, কীর’ম পড়বে একটু হিসেব করে দ্যাখ তো।”

“ও আমার মাপা হয়ে গেছে। তিন লাখে ঝকাস নেমে যাবে।” শাঁটুলের বিশেষজ্ঞ মতামত মুহূর্তে হাজির, “তবে বস, পিডব্লুডি তো করবে কাজ, আরও দশ পার্সেন্ট হেসে খেলে ধরে রাখো।”

“ঠিক আছে, সাড়ে তিনই স্যাংশন করিয়ে দেব।” খোনাস্বর অভয় দিল, “ওপাশে আরও দু’খানা ঘর পেলে আশাবরীর তো অনেকটাই সুবিধে...”

সংলাপগুলো অলীক মনে হচ্ছিল অহনার। সে আর্জি জানায়নি, কোথাও কারও কাছে প্রকাশ করেনি তার বাসনা, হঠাৎ আশমান থেকে টাকা ঝরে তৈরি হয়ে যাবে বাড়িটা! রাজনীতির লোকরা কি অন্তর্যামী! উঁহু, ছোটবেলায় কোথায় যেন পড়েছিল না, দেয়ার ইজ় নাথিং কল্‌ড্‌ অ্যাজ় ফ্রি লাঞ্চ। জীবনে তো সে দেখেওছে বিনামূল্যে কিছুই জোটে না, মা-বাবা-দাদার ভালবাসা পেতেও মোটা দাম চুকোতে হয়!

কফি এসে গেছে। অহনাই কাপগুলো বাড়িয়ে দিল হাতে হাতে। নিজেও নিল। স্মিত মুখে বলল, তা আমাকে এর জন্য কী করতে হবে?

“কিচ্ছু না। পি ডব্লু ডি-র ইঞ্জিনিয়রকে পাঠিয়ে দেব, উনিই মেপেজুপে হিসেব করে একটা এস্টিমেট বানিয়ে দেবেন। আপনি সেইটা আর সঙ্গে একটা আবেদনপত্র লিখে রাখবেন। গদা নিজে এসে নিয়ে যাবে।... দু’মাসের মধ্যে আপনার এখানে মিস্ত্রি লেগে পড়বে, শীতের আগেই দেখবেন কাজ শেষ।”

তারক একটু দম নিল। তারপর কফিতে একটা বড় চুমুক দিয়ে বলল, “তা ম্যাডাম, আমরা যেমন আশাবরীর জন্য মাঠে নামব, আশা করি আপনিও আমাদের একটু মদত করবেন।”

অহনার স্নায়ু নাড়া খেল সামান্য। সামলে নিয়ে বলল, কীভাবে?

“তেমন কিছু না।” গদা একবার তারককে দেখে নিয়ে বলল, “আপনি নিশ্চয় শ্যামাঙ্গিনীর নাম শুনেছেন?”

“ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি?” অহনা সতর্ক ভাবে বলল, “হ্যাঁ, সাইনবোর্ড বিজ্ঞাপন দেখেছি।”

“খুব জেনুইন প্রতিষ্ঠান, ম্যাডাম। ওরাও গ্রামের লোকদের ভাল চায়। আপনারই মতন। ...তাই বলছিলাম কি... আশাবরীর পাশে পাশে এখানে যদি শ্যামাঙ্গিনীরও একটা অফিস খোলা যায়... আপনিই তার হেড থাকবেন, ...মানে এখানে শ্যামাঙ্গিনীর টাকাপয়সা যা সংগ্রহ করা হবে... আপনি তার থেকে একটা মোটা কমিশনও পাবেন। আপনাকে খাটতেও হবে না... আমাদের লোকই যা করবার করবে...”

শ্যামাঙ্গিনীর ব্যাবসার ধরন মোটামুটি জানে অহনা। জমা টাকার বিনিময়ে চড়া সুদ দেয়। কীভাবে দেয়, সে সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা আছে বই কী। সেই মানুষটাই তো আছে এই ধান্দায়। কোন দিকে নিয়ে যায় এই কারবার, আন্দাজ আছে বলেই না সে আজ আলাইপুরে। জেনেশুনে সেই বিষ পান করবে অহনা। কভি নেহি। আস্ত সংসার ভেঙে সে চলে এল, আর এ তো সামান্য একটা বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার টোপ!

কিন্তু এদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি তো করা যাবে না, বুদ্ধি করেই ঠেকাতে হবে। পলক ভেবে অহনা সবিনয় তারককে বলল, “সরি স্যার। আশাবরীতে ওরকম কিছু তো করা যাবে না।”

“কেন?”

“জমি বাড়ি সব তো ব্যাঙ্ককে মর্টগেজ করা আছে। সত্যি বলতে কী, আমি এখন মর্টগেজ না ছাড়িয়ে বাড়ির কাজেও হাত দিতে পারব না।”

“তো ছাড়িয়ে নিচ্ছেন না কেন? আমরা কি হেল্প করতে পারি?”

“অনেক টাকার ব্যাপার স্যার। পনেরো-ষোলো লাখ। তা ছাড়া আমার মাও তো মর্টগেজে একজন পার্টি... বুঝতেই তো পারছেন... ওঁর বয়স হয়েছে...”

একেবারেই অর্থহীন যুক্তি, কিন্তু এই মোটা মাথা ধান্দাবাজদের জন্য এটাই যথেষ্ট, একটু ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে পারলেই এরা ভারী বিজ্ঞের মতো মুখ করে গিলে নেবে, অহনার এই অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। তুম্‌বো মুখে একটুক্ষণ বসে রইল তিন মূর্তি, তারপর গিয়ে উঠেছে মোটরসাইকেলে। হেলমেট ছাড়াই। স্টার্ট দেওয়ার আগে অহনা ভারী দুঃখী দুঃখী মুখ করে তারককে বলল, “আমার ভাগ্যটাই খারাপ স্যার, কত বড় একটা সুযোগ মিস হয়ে গেল বলুন তো?”

ঢকঢক ঘাড় নেড়ে লোকগুলো চলে যেতেই অহনার পেট গুলিয়ে হাসি এসে গেল। অনেক দিন পর হাসছে প্রাণ খুলে। ইলারাও অবাক। এমন উচ্ছল মূর্তিতে ম্যাডামকে তারা কখনও দেখে না তো।

বেশিক্ষণ আর অফিসে না থেকে বাড়ি এল অহনা। কৃষ্ণা রাতের রান্না বসিয়েছে, এরপর রুটি করবে। তাকে চা বানাতে বলে বিছানায় গড়াগড়ি খেল খানিকক্ষণ। পলকের জন্য মনে হল ব্যাঙ্কে গিয়ে ওভারড্রাফটের লিমিটটা বাড়িয়ে দিয়ে আসবে। পরক্ষণে মত বদলাল। তুৎ, বোকাগুলো থোড়াই ব্যাঙ্ক অবধি গিয়ে খোঁজখবর করবে, মিছিমিছি তার চাপ বাড়ানোর প্রয়োজন কী।

চা শেষ করে বৈকালিক স্নান। ক’দিন খুচরো খাচরা বৃষ্টির কারণে আজ গরমটা বেশ প্যাচপ্যাচে, গায়ে জল ঢেলে আরাম হল খুব। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা ছটফটানিও চলছে। ঘটনাটা কারওকে না বলতে পারলে স্ফূর্তিটা যেন জমছে না। কাকে জানাবে? ফোন করবে মাকে? নাহ মা যা ভিতু, ঘাবড়ে যাবে, উলটে হয়তো জ্ঞান ঝাড়তে আরম্ভ করবে। অর্ঘ্যটা গেল কোথায়? সন্ধে তো নেমে গেল, সে এখনও ফিরছে না কেন?

মোবাইলে অর্ঘ্যর নম্বর টিপল অহনা। যান্ত্রিক ঘোষণা বাজছে... যে নম্বরটি আপনি ডায়াল করেছেন এই মুহূর্তে সেটি সুইচড অফ অথবা মোবাইল পরিষেবার বাইরে...। কী ব্যাপার, অর্ঘ্য তো ফোন বন্ধ রাখে না! কোথায় এমন গেল যেখানে টাওয়ার মিলছে না?

বাইরে মোটরসাইকেলের আওয়াজ। অহনার বুক ধক করে উঠল। মক্কেলরা ফিরে এল নাকি?

শঙ্কিত পায়ে গ্রিলবারান্দায় আসামাত্র অহনার মুখমণ্ডল হাসিতে ভরে গেছে। সুশোভন স্যার।

দরজা খুলে দিয়ে অহনা হাউমাউ করে উঠল, "কোথায় ছিলেন অ্যাদ্দিন? কতবার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই আপনাকে ধরতে পারছি না। ফোন কেন বন্ধ রেখেছিলেন? ভাবছিলাম কাল পরশুই আপনার বাড়ি গিয়ে হানা দেব..."

"আস্তে আস্তে। এত প্রশ্নের উত্তর কি একবারে দেওয়া যায়?" দীর্ঘদেহী মানুষটি দু'হাত তুলে থামালেন অহনাকে, "একটু জিরোতে দাও, চা জল খাওয়াও... ওফ, বড্ড থকে গেছি।"

এই বাক্যটি সুশোভনের মুখে কখনও শোনেনি অহনা। বয়স অনেকই হয়েছে স্যারের, চুয়াত্তর পঁচাত্তর তো বটেই, কিন্তু টগবগ করেন সারাক্ষণ। এত জোরে হাঁটেন, অল্পবয়সিরাও পাল্লা দিতে হাঁপিয়ে যায়। মুখেচোখে বয়সের ছাপও নেই তেমন। মাথার চুলগুলো ধবধবে সাদা না হলে স্বচ্ছন্দে পঞ্চান্ন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

বাইরের ঘরের সোফায় বসেছেন সুশোভন। হেলান দিয়ে। লম্বা পা সামান্য ছড়িয়ে। পরনে আজ পাজামা পাঞ্জাবি নয়, প্যান্ট-শার্ট। হেলমেটখানা রেখেছেন সেন্টারটেবিলে।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে জল আনল অহনা। সুশোভনের হাতে গ্লাস ধরিয়ে বলল, "আপনাকে এত টায়ার্ড দেখাচ্ছে কেন স্যার?"

"আই অ্যাম ফাইন।" এক চুমুকে জল শেষ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন সুশোভন। দু'হাত সোফার কাঁধে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, "ব্যক্তিগত কাজে কয়েক দিন কলকাতায় গিয়ে থাকতে হচ্ছিল। আজই

ফিরেছি। ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই। আমার বিশ্বস্ত স্কুটারটা আমায় বিট্রে করল, ব্যাটা স্টার্ট নিল না। অগত্যা ভাইয়ের এই দামড়া মোটরসাইকেল। অনেক দিন অভ্যেস নেই তো... এত ভারী... তার ওপর তোমাদের এই রাস্তা... দম নিকলে গেছে।”

“আপনার ভাই মানে সুশীতলবাবু তো? স্টেশনের ধারে যাঁর ওই বড় ওষুধের দোকান...”

“ভাল নামটা জানো তা হলে?” হাসছেন সুশোভন, “টিয়াডাঙার লোকরা তো ওকে অন্য নামে চেনে। সুশোভনের ভাই অশোভন।”

“এমা ছি ছি কেন?”

“দ্যাখোনি ওর কারবার? কলকাতা থেকে নামকা ওয়াস্তে স্পেশালিস্ট ডাক্তার এনে বসাচ্ছে আর তিন হাতে কামাচ্ছে। ডাক্তারের ফি থেকে কমিশন, তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধ বিক্রির লাভ, প্লাস ডাক্তারবাবুরা হেন টেস্ট নেই যা করান না, সেই সুবাদে ওর প্যাথোলজিকাল ল্যাবরেটরিটাও গড়গড়িয়ে চলছে।” সুশোভন একটু দম নিলেন, “জানো, ও এক সময়ে দারুণ মার্কস পেয়ে ডাক্তারি পাশ করেছিল। প্যাথোলজি ছিল ওর স্পেশাল পেপার। বাবার স্বপ্ন ছিল, তখনকার এই অজ টিয়াডাঙার মানুষদের যেন আর রক্তটক্ত পরীক্ষার জন্য দূরদূরান্তরে যেতে না হয়, ছোটন যেন একটা ল্যাবরেটরি খোলে এখানে। মিনিমাম চার্জ় নেবে, দরকার হলে গরিবদের কাছে থেকে পয়সা নেবে না...। ছোটনও সেই মটো মেনে ওই জায়গায় গোড়ায় একটা ডিসপেন্সারি খুলেছিল। নিজে চিকিৎসাও করত, পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাত নিজের ল্যাবরেটরিতে। দশ বছরও গেল না, চিকিত্সাটা একেবারেই ছেড়ে দিয়ে ব্যাটা পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী বনে গেল। এখন রোগীর গলায় গামছা দিয়ে টাকা কামায়।”

“আপনি স্যার অকারণে নিন্দে করছেন। আজকাল মাগনা কি কিছু হয়?” অহনা ঠাট্টার সুরে বলল, “ওভাবে দেখলে তো স্যার আমিও তো মেয়েগুলোকে চুষছি। ওরা হয়তো টের পাচ্ছে না, কিন্তু আমি তো একশো টাকা ধার দিয়ে দুশো টাকা উশুল করছি।”

“তোমার ব্যাপারটা আলাদা।” সুশোভন দু’দিকে ঘাড় নাড়ছেন, “তুমি জানো না, গ্রামের মেয়ে-বউদের তুমি কতটা ভরসা। ব্যাবসা করতে করতেই কত সহায় সম্বলহীনাকে তুমি পায়ের তলায় মাটি জুগিয়েছ... পরিবারে তাদের ওজন কত বেড়ে গেছে...। আর লাভের পয়সায় তো তুমি ব্যাঙ্কের পাশবই মোটা করছ না, আরেক দল মেয়ের পিছনে ঢালছ।”

সুশোভনের মুখে প্রশংসা শুনলে অহনা যেন গুটিয়ে যায়। সে তো জানে অত কিছু ভেবে সে আশাবরী খোলেনি। শুধু নিজের মতো করে বাঁচতে চাওয়ার তাড়নায় স্যারের পরামর্শে এই পথটা বেছে নিয়েছিল। প্রথম প্রথম হয়তো তৃপ্তিও পেত, কিন্তু এখন একঘেয়েমির ফাঁসকলে বিরক্তির গাদ পুরু হচ্ছে ক্রমশ।

কৃষ্ণার কেটে পড়ার সময় হয়েছে। উঠে গিয়ে তাকে চা জলখাবারের কথা বলে এল অহনা। ফের বসতেই সুশোভনের প্রশ্ন, “তোমার মাকে দেখছি না যে?”

“কলকাতা গেছে। দাদার কাছে। সামনের সপ্তাহে ফিরবে।”

“ও। তার মানে তুমি এখন একা?”

“না। অতিথি আছে একজন।”

সংক্ষেপে অর্ঘ্যর পরিচয় দিল অহনা। শুনে সুশোভন বললেন, “বাহ, তোমার তো তা হলে গল্পে আড্ডায় ভালই সময় কাটছে।”

অহনা মনে মনে বলল, সে আর থাকে কতক্ষণ? যদি বা থাকে, নিজের খুপরিতে বেশিটা সময় কাটায়। টিভিতে শুধু খবরের চ্যানেল দেখে, সিনেমা সিরিয়াল খেলাধুলো কোনও কিছুতেই উত্সাহ নেই। অহনাও তো খুব বাকপটু গপ্পো টাইপ নয়, দু'জনের তা হলে জমবে কী করে?

মন্তব্য না করে মৃদু হাসল অহনা। কেজো প্রসঙ্গে ঢুকতে চাইল, "আপনাকে স্যার একটা খবর দেওয়ার ছিল।"

"আমি জানি। সরকারি অর্ডার পেয়েছ তো?"

"হুঁ।"

"সুষ্ঠু ভাবে ডেলিভারিটা দাও, আরও অর্ডার পাবে। বোধহয় শিগগিরি কিছু সোলার প্যানেলও চাইবে। পরিবেশ নিয়ে এখন খুব মাতামাতি চলছে তো... তুমিও তার কিছুটা ফায়দা নাও।"

"কিন্তু স্যার...তা হলে তো কারখানাটা আরও বাড়াতে হয়..."

"কে বারণ করেছে বাড়াতে? বিল্ডিংটা ওভাবে ফেলে রেখেছ কেন, শেষ করো। তেমন হলে ব্যাঙ্কে অ্যাপ্রোচ করো, তারা নিশ্চয়ই তোমায় টাকা দেবে। ব্যাঙ্ক আপত্তি করবে না, আই অ্যাম শিয়োর।"

অহনা কাঁটা হয়ে গেল। সুশোভন যদি শোনেন ব্যাঙ্কের প্রস্তাবে সে না বলে এসেছে... আহত হবেন নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে লঘু পরিবেশ আনতে চাইল ঘরে। বৈকালিক উপদ্রবের কাহিনি বলল স্যারকে। রসিয়ে রসিয়ে।

সুশোভন তো শুনেই গম্ভীর। বললেন, "কাজটা কিন্তু তুমি ঠিক করোনি।"

"মানে? এখানে শ্যামাঙ্গিনীর অফিস খুলবে, আমি অ্যালাও করে দেব?"

"না। কায়দা করে না এড়িয়ে সরাসরি ওদের প্রস্তাব নাকচ করা উচিত ছিল।"

"ওরা তাতে ছাড়ত? জোরজার করত না?"

“এখনও কি তুমি ছাড় পাবে ভেবেছ? রাজনীতির লোকদের আন্ডার এস্টিমেট কোরো না। ওরা আবার আসবে, আসবেই। আশাবরীর গুডউইল ওরা ব্যবহার করতে চায়। তোমায় ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে হবে, তুমি এটা হতে দেবে না। কাজটা হয়তো কঠিন, কিন্তু কৌশল করে তুমি আশাবরীকে বাঁচাতে পারবে না। একমাত্র তুমি রুখে দাঁড়ালেই ওরা হয়তো পিছু হঠতে পারে।”

সুশোভনের যুক্তি একেবারেই মনঃপূত হল না অহনার। স্যারের আর কী, বলেই খালাস, ভুগতে তো হবে অহনাকেই। লোকগুলো মোটেই সুবিধের নয়, আক্রোশের বশে যখন তখন হামলা করতে পারে। অতএব তুইয়ে-বুইয়ে চলাই তো ভাল। কোনও অনৈতিক ব্যাবসার সঙ্গে সে সংস্রব রাখবে না, এতে যদি আশাবরী উঠে যায় তো যাক।

টোস্ট ওমলেট রেখে গেল কৃষ্ণা। চা-ও। প্লেট হাতে তুলে কী যেন ভাবছিলেন সুশোভন। টোস্টে ছোট কামড় দিয়ে বললেন, “যাক গে, কী করবে সেটা তোমার ব্যাপার। তোমার ডিসিশন তো এখন থেকে তোমাকেই নিতে হবে।”

অহনা কথাটা ঠিক বুঝল না। অস্ফুটে বলল, “মানে?”

“কালই কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। কবে আসব ঠিক নেই। মে বি এক মাস, মে বি দু’মাস, মে বি এক বছর... অনাথ আশ্রমের জন্য একজন লোক ঠিক করেছি... ইনফ্যাক্ট সেই কারণেই আজ আমার টিয়াডাঙায় আসা।”

অহনা বিস্মিত স্বরে বলল, “কেন স্যার? এখানে থাকবেন না কেন?”

“উপায় নেই বলে।” সুশোভনের লম্বাটে উজ্জ্বল মুখে ফ্যাকাশে হাসি, “আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ। প্রায় মৃত্যুশয্যায়, দুটো কিডনিই তার ফেল করেছে। লাস্ট উইকে অ্যাডমিট করেছি হসপিটালে, পরশু ছাড়বে। জানোই তো টালিগঞ্জে ছোট একটা ফ্ল্যাট আছে আমার। ওখানেই তুলব। তারপর ডায়ালিসিস চলবে রোজ। যে ক’টা দিন বাঁচে।”

প্রায় সহজ স্বরেই বললেন সুশোভন, কিন্তু অহনার বুকে যেন ধক করে লাগল। গীতালি আন্টিকে সে বেশ কয়েকবার দেখেছে। সুশোভনের ঠিক বিপরীত। নির্জীব ধরনের মহিলা। কথাবার্তা বলেন খুব কম। পুজোআর্চা নিয়েই থাকেন সারাক্ষণ। তাঁর এই দশা?

অহনা বিড়বিড় করে বলল। "হঠাৎ ধরা পড়ল বুঝি?"

"ফাইনাল ডায়াগনোসিস এখন হল। তবে অনেক দিন ধরেই তো ভুগছিল। সুগার, হাই প্রেশার...। চিকিৎসা করাতে চাইত না ঠিক মতো। তার যা ফল হয়।" সুশোভনকে কেমন যেন বিমনা দেখাল, "আসলে বহুকাল আগেই তো বাঁচার ইচ্ছেটা চলে গিয়েছিল।"

জিজ্ঞেস করব না করব না করেও অহনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কেন স্যার?"

"সে এক বিশ্রী উপাখ্যান। আমাকেই তার ভিলেন বলতে পারো।" সুশোভনের প্রাণবন্ত মুখখানা হঠাৎই করুণ, "আমার একমাত্র ছেলেটা... তাতার... ও ছিল একটু অন্য ধাতের। পড়াশোনায় খুব একটা মন ছিল না। কবিতা লিখত, ছবি আঁকত...। গীতালি ওসব একদম পছন্দ করত না। ছেলেকে একটা বড় কিছু হতে হবে, দারুণ ব্রাইট কেরিয়ার গড়বে, এই ছিল তার স্বপ্ন। ছেলের পিছনে এঁটুলির মতো লেগে থাকত সারাদিন।... আমার মনে হত গীতালি ঠিক করছে না। কিন্তু অশান্তির ভয়ে প্রতিবাদ করিনি। বুঝিয়ে বাঝিয়ে ম্যানেজ করতে চেয়েছি গীতালিকে। লাভ হয়নি, গীতালি তার জেদে অনড়। পাঁচটা টিউটর লাগিয়ে রগড়াচ্ছে ছেলেকে... জয়েন্টে বসতে বাধ্য করল... মার গুঁতোয় কেমিক্যালে চান্সও পেয়ে গেল যাদবপুরে। কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ার ওঠার পরীক্ষায় ফেল করল তাতার। তারপরই হঠাৎ একদিন সিলিংফ্যান থেকে..."

অহনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্বরযন্ত্র যেন বিকল। স্যারের ছেলে মারা গিয়েছে শুনেছিল, বটে, তবে এভাবে...? আশ্চর্য, অমন একটা অতীত আছে, স্যারকে দেখে তো বিন্দুমাত্র টের পাওয়া যায় না?

সুশোভন স্যার বলেই চলেছেন, “একটা সুইসাইড নোটও রেখে গিয়েছিল। মা, তোমার আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারলাম না। ক্ষমা কোরো। ...তারপর থেকেই গীতালি ডুবে গেল বিষাদের গহ্বরে। বেঁচে রইল বটে, কিন্তু মৃত্যুকে আহ্বান করে চলেছে এক মনে। প্রায় সাধনার মতো।”

অহনা নিচু স্বরে বলে উঠল, “পাপবোধ...?”

“পাপবোধ কি আমার নেই? দোষ কি আমার কম?” সুশোভনের কণ্ঠ দিয়ে আচমকা আর্তনাদ ছিটকে এল। পরক্ষণেই সামলে নিয়েছেন। অদ্ভুত শান্ত গলায় বললেন, “তোমাকে একটু আগেই বলছিলাম না, যেটাকে ভুল মনে হবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করবে? বলছি, কারণ সে কাজটা আমি নিজে করতে পারিনি। আমার তো উচিত ছিল গীতালিকে আটকানো। তাতার যাতে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠে সেটা নিশ্চিত করা। আই ফেইল্ড মাই টাস্ক। ট্যাক্টিক্যালি এড়াতে চেয়েছি অশান্তি। পরিণামটা কী হল? টানা বাইশ বছর ধরে তিলে তিলে আত্মহত্যা করেছে গীতালি। আমারই চোখের সামনে। এ বড় কঠিন সাজা। এরকম ভুল কিন্তু কোরো না।”

অনেকক্ষণ চলে গেছেন সুশোভন। অহনা শুয়ে ছিল বিছানায়। অসম্ভব ভার হয়ে গেছে মনটা। বাইরে মেঘ ডাকছে। মাঝে মাঝেই ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। কিছুই যেন প্রবেশ করছিল না অহনার চেতনায়। স্যারের শেষ কথাগুলো এখনও যেন ঘণ্টাধ্বনির মতো বাজছে মাথায়।... “যাই, অন্তিম কাজটা সারি, তারপর তো শুরু হবে আমার প্রতীক্ষা। একা একা...।”

সুশোভন স্যার কি ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে কাজে ডুবে থাকেন? কিন্তু অহনা কীসের প্রায়শ্চিত্ত করছে? একটা মানুষকে চিনতে ভুল হয়েছিল, শুধু এইটুকুর জন্য এই তরঙ্গহীন সুখবিহীন জীবনকে টেনে ঘষটে বয়ে নিয়ে যেতে হবে? যতক্ষণ না দেহটা চিতায় ওঠে?

দরজায় ছায়া। অর্ঘ্য ঢুকল ঘরে। কখন এল, অহনা টের পায়নি তো!

অর্ঘ্যর হাতে অহনার মোবাইল। ভুরু কুঁচকে বলল, “কী হল, কখন থেকে বাজছে... ধরছ না...”

অহনা মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে বসল, “কার ফোন?”

“শেফালি মাসির।”

হাত বাড়িয়ে অহনা নিল ফোন, “হ্যাঁ বলো?”

“এই অবেলায় ঘুমোচ্ছিলি নাকি?”

আমার তো দিন রাত সর্বক্ষণই অবেলা। বলতে গিয়েও অহনা সংবরণ করল নিজেকে। গলা ঝাড়ল, “কী বলবে বলো?”

“জানিস কী হয়েছে আজ? সুগত এসেছিল আমার কাছে?”

“তো?” অহনার ক্ষণপূর্বের বিষণ্ণতা সেকেন্ডে খানখান। তপ্ত স্বরে বলল, “আমি শুনতে আগ্রহী নই। অন্য কিছু বলার আছে?”

“আরে শোনই না। ও খুব দুঃখ করছিল। অহনা আমাকে সারাজীবন ভুল বুঝে গেল... আমি কিন্তু অহনাকে মাথায় করেই রাখতে চেয়েছি...”

“আহ মা, থামবে। কতবার তোমাদের বলব আমি ওকে ঘেন্না করি...”

“ও মনে হল ভীষণ অনুতপ্ত। নিজের দোষটা বুঝতে পেরেছে।”

“স্টপ ইট।” অহনা চিৎকার করে উঠল, “আমি শুনতে চাই না, তোমার ভাট বকা বন্ধ করো, প্লিজ়।”

আবার কী যেন বলতে যাচ্ছিল শেফালি, ফোন বন্ধ করে অহনা মোবাইলটা আছড়ে ফেলল বিছানায়। অন্ধ রাগে ফুঁসছে।

হঠাৎ পিঠে কার হাত। চমকে তাকাল অহনা। অর্ঘ্য।

কী আশ্চর্য, হাতটা ঠেলে সরাতে পারছে না কেন অহনা! বরং ছোঁয়াটা যেন ভাল লাগছে! কেন যেন মনে হচ্ছে, এমনই একটা স্পর্শের বড় প্রয়োজন ছিল এখন!

.

॥ ৮ ॥

ঝড়ের গতিতে কম্পিউটারে টাইপ করছিল অহনা। আজ সক্কালবেলায় এসে তাঁতিয়ার ভাবী সদস্যদের পুরো লিস্ট দিয়ে গেছে মায়া, দেরি না করে হাতের কাজটা চুকিয়ে রাখছে। সতেরো জনের বিশদ বায়োডাটা তৈরি, কম ঝকমারি। কাল রোববার, অহনা কাল অফিসের ছায়া মাড়াবে না। সপ্তাহে ছ'-ছ'টা দিন সে বিস্তর খাটে, একটা দিন অন্তত তার নিজস্ব থাকুক। মা কলকাতা যাওয়া ইস্তক কৃষ্ণার হাতের অখাদ্য রান্নাই সোনামুখ করে খেয়ে চলেছে অর্ঘ্য, এক-আধ দিন তো অহনারও উচিত রান্নাঘরে ঢোকা, নয় কি?

তা ছাড়া অহনারও তো ভাল লাগবে। বহুকাল পর আবার কারও জন্যে হাতাখুন্তি ধরতে ইচ্ছে করছে যে। অর্ঘ্য এত ভাল, কাল ওইরকম ভয়ংকর রেগে গিয়েছিল অহনা, কী নরম করে কথা বলে বলে শান্ত করল অহনার মনটাকে। মা'র মুখে ওইসব বাক্য শুনলে দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না অহনা, বিচ্ছিরি স্মৃতিগুলো ঝাপটা মারে সারারাত, শেষ পর্যন্ত ঘুমের বড়ি গিলতে হয়। কাল কিন্তু অহনার দিব্যি নিদ্রা এসে গেল, ট্যাবলেট ছাড়াই। এর জন্যই কি একটু বাড়তি যত্ন পেতে পারে না অর্ঘ্য?

ওফ, শেষ হয়েছে কাজ। এবার প্রিন্ট নেওয়ার পালা। প্রিন্টারের ট্রে-তে কাগজ ভরতে গিয়ে অহনার ভুরুতে ভাঁজ। প্যাকেট প্রায় খালি, শেষ দু'-চার পিস মাত্র পড়ে, ওতে তো কুলোবে না। বাজারে মোবাইলের দোকানটায় জেরক্স মেশিন বসিয়েছে, ওদের কাছে থাকতে পারে কাগজ। বিকেল হয়ে এল, অনেকক্ষণ টানা কম্পিউটারে বসে শরীরও আর চলছে না... ইলাকে পাঠিয়ে দেবে? তুৎ, যা ট্যাঁড়শ মেয়ে, কী কাগজ এনে হাজির করবে তার ঠিক আছে? কাল রোববার দোকানটা বন্ধ থাকতে পারে... তা হলে সেই সোমবার। ওই দিন কাগজে এনে, ছেপে, আর বোধহয় কলকাতা যাওয়া হবে না। ওদিকে সোলারিসের লোক খানিক আগে ফোন করেছিল। ডেমো দেওয়ার মাল নাকি এসে গেছে। অহনা সোমবার ওদের অফিসে যাবে বলল...

আলস্য ঝেড়ে অহনা উঠেই পড়ল। মোবাইলে মাত্র আট টাকা পনেরো পয়সা ব্যালেন্স আছে, রিচার্জ করিয়ে নেওয়াটাও খুব জরুরি। মোপেড নিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছেছে দোকানে।

কাউন্টারে মুখচেনা তরুণ। কানে হেডফোন গোঁজা। সংগীতপ্রেমের হদ্দমুদ্দ! নামটা বোধহয় রাজু। অহনা অবশ্য নাম ধরে ডাকে না কখনও, তাতে একটা বাড়তি ঘনিষ্ঠতার ভাব এসে যায়।

অহনাকে দেখে রাজু উঠে দাঁড়িয়েছে। কান থেকে সরাল হেডফোন। শশব্যস্ত গলায় বলল, "কী লাগবে ম্যাডাম?"

"প্রিন্টারের কাগজ রাখেন নিশ্চয়ই?"

"আছে। তবে আমরা তো বেচি না। নিজেদেরই কাজে লাগে। আপনার ক'টা দরকার?"

"অন্তত খান পঞ্চাশেক। তারপর নয় টিয়াডাঙা থেকে কিনে নেব।"

"হয়ে যাবে।"

গুনে কাগজ প্যাক করে দিল রাজু। মোবাইলেও টাকা ভরে নিল অহনা। একটা পাঁচশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়েছে। ফেরত দিতে দিতে রাজু বলল, "ম্যাডাম, আপনার বাড়িতে যিনি এসেছেন, উনি কি আপনার রিলেটিভ?"

এই ধরণের প্রশ্ন অহনা একদম পছন্দ করে না। তার বাড়িতে কে এল গেল তাই নিয়ে গাঁয়ে যেন বড় বেশি কৌতূহল। বাবলা যখন এসেছিল তখনও টুকটাক জিজ্ঞেস করত লোকে। একেই বোধহয় বলে গ্রাম্যতা।

অহনা নীরস স্বরে বলল, "ওই রকমই।"

"বাঙালি?"

"মানে?"

“নাহ...উনি কাল একটা নতুন সিম করালেন... অদ্ভুত এক টাইটেল দেখলাম... রত্নম না কী যেন। বাংলা অবশ্য ভালই বলছিলেন।” রাজুর হাসি চওড়া হল, “কলকাতায় থাকেন বুঝি?”

“হুঁ।”

সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে প্যাকেট হাতে বেরিয়ে এল অহনা। অবাক হয়েছে খুব। ওরকম দু’নম্বরি বাড়তি সিম বানানোর কী অর্থ? ফোনও তো অর্ঘ্য আজকাল বন্ধই রাখে সারাক্ষণ। কোনও গোলমেলে ব্যাপার নেই তো? হয়তো কোনও অপকর্ম করে এসে এখানে গা-ঢাকা দিয়েছে!

না না, ছি ছি, এসব কী ভাবছে সে? অর্ঘ্য মোটেই এরকম ছেলে নয়। হতেই পারে না। অন্যায় কিছু করে লুকিয়ে থাকলে তার ছাপ ফুটে উঠত না অর্ঘ্যর মুখেচোখে? কথায় বার্তায়? গ্রামে গ্রামে ঘুরে তথ্য সংগ্রহের কাজটাও তো করছে সত্যি সত্যি। অহনা খবর পায় নিয়মিত, তা ছাড়া অর্ঘ্য তাকে ডাটাশিটও দেখিয়েছে। তা হলে...?

এইসব ভাবতে ভাবতেই অহনা চলেছে মোপেডে। আশাবরীতে ফিরল। কাগজ নিয়ে অফিসের দিকেই এগোচ্ছিল, আচমকা মাটিতে গেঁথে গেল পা।

একটা দুধসাদা মহার্ঘ প্রাইভেট কার ঢুকছে কম্পাউন্ডে। চালকের আসনে কে ও? সুগত না?

হ্যাঁ, সুগতই। পরনে সেই চিরাচরিত পোশাক। নেভি ব্লু সুট, গলায় টাই।

মাথায় ঠাঁইঠপাঠপ নেহাই পড়ছিল অহনার। একটুক্ষণ ন যযৌ ন তস্থৌ দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। দাঁতে দাঁত ঘষে চাপা স্বরে বলল, “আবার? বারণ করেছি না এখানে আসতে?”

“তবু এলাম। সুগত যেন নির্বিকার। গাড়িতে হেলান দিয়ে পকেট থেকে বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট বার করল। ঠোঁটে রাজা মাপের সিগারেট ঝুলিয়েছে। লাইটার জ্বালিয়ে ধরাল। আলাইপুরের বাতাসে কটু ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “গাড়িখানা দেখেছ? লাস্ট উইকে কিনলাম। এইট্টিন প্লাস পড়ল। ভেরি স্মুথ ড্রাইভিং। রাস্তাঘাটে বাম্প খানাখন্দ কিছু টের পাওয়া যায় না।”

সেই হামবড়া। সেই চালমারা কথাবার্তা। মা বলছিল লোকটার নাকি পরিবর্তন এসেছে! ওহ্, পরিবর্তন শব্দটায় ঘেন্না ধরে গেল!

অফিসের দিক থেকে উঁকিঝুঁকি আসছে কি না দেখে নিয়ে অহনা তীব্রস্বরে বলল, “আউট। এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও। ইউ নো, আমি তোমায় এক মুহূর্ত স্ট্যান্ড করতে পারি না।”

“তা বললে চলে ডার্লিং? পাক্কা আড়াই ঘণ্টা ড্রাইভ করে এলাম তা কি এক্ষুনি বিদেয় হওয়ার জন্যে?”

সুগতও চারদিকটা একবার দেখে নিল, “আশা করি চেঁচামিচি জুড়ে সিনক্রিয়েট করবে না। তাতে তোমারই কিন্তু লোকসান। আফটার অল আশাবরী ম্যাডামের একটা প্রেস্টিজ় আছে তো।”

“কী চাও তুমি? কেন এসেছ?”

“বাইরে দাঁড়িয়ে কথা হয় নাকি। চলো, ভেতরে গিয়ে বসি।”

“তোমার সঙ্গে আমার কোনও কথা নেই।”

“সো হোয়াট? আমার তো আছে।” সুগত সিগারেটটা চেপে চেপে নেভাল জুতো দিয়ে। মশমশিয়ে হেঁটে গ্রিলবারান্দা খুলে ঢুকেছে অন্দরে।

অহনার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। দরজা খোলা... কৃষ্ণা এসে গেছে নাকি? সুগত শেষ যেবার হানা দিয়েছিল, দিনটা ছিল রোববার। কৃষ্ণা তখন সবে যোগ দিয়েছে কাজে। অহনার কাছে প্রবল ঝাড় খেয়ে সুগত সেদিন গনগনে মুখে চলে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি। কৃষ্ণা ব্যাপারটা পুরো আঁচ করতে পারেনি। তবু তার কত কৌতূহল... “সুন্দর মতো বাবুটা কে গো! তুমি এত বকছিলে কেন! বাবুর গাড়িটা কী ভাল, এস্টার্ট দিলেও শব্দ হয় না!” সেদিন যা হোক কিছু বুঝিয়ে পরিস্থিতি ম্যানেজ করা গিয়েছিল, আজ কি তা পারবে? কৃষ্ণা এখন অনেকটাই পুরনো, অহনা শেফালির তর্কাতর্কি থেকে কিছুটা হয়তো আন্দাজও আছে তার। আজকের বাদানুবাদের পর আর কি কিছু বোঝার বাকি থাকবে কৃষ্ণার! তারপর গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। চাটনি সহযোগে। কে কী জানল অহনা তার

পরোয়া করে না। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে লোকজন রসালো চর্চা করছে, এটা ভাবলেই অহনার গা গুলিয়ে ওঠে।

এখন উপায়ও তো নেই। সে বাড়ি না ঢোকা অবধি সুগত গেঁড়ে বসে থাকবে। আত্মপরিচয় ঘোষণা করে কৃষ্ণাকে হুকুমও ছুড়তে পারে। যা দু'কান কাটা লোক, কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প জোড়াটাও বিচিত্র নয়। উফ কী জ্বালা। অহনা রে, তোর মান মর্যাদা সব গেল!

অহনা বড় করে একটা শ্বাস টানল ফুসফুসে। শক্ত করল নিজেকে। যা হয় হবে, আজ এমন শিক্ষা দেবে সুগতকে যেন আলাইপুরের ছায়া আর না মাড়ায়।

ভেতরে পা রেখে অহনার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। রান্নাঘরের শিকল টানা তার মানে কৃষ্ণা আসেনি। তবে কি অর্ঘ্য...? সন্ধে নামার আগে সে ফেরে না সচরাচর, আজ এত তাড়াতাড়ি? ওহ, এ তো আর এক ধরনের অস্বস্তি। তবু কৃষ্ণা এসে পড়ার চেয়ে ভাল। সে শুনল তো শুনল, অহনার তাতে কী এমন ক্ষতি!

সুগত বড় সোফায় বসে। হাতে আবার সিগারেট। একটা খালি কাপ এনে ঠং করে টেবিলে রাখল অহনা, "দয়া করে ঘর নোংরা কোরো না। এটাতে ছাই ফ্যালো।"

কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। একটু যেন জোরে জোরেই টান দিচ্ছে সুগত।

অহনা বসল মুখোমুখি। পলকের জন্য চোখ অর্ঘ্যর দরজায়। বেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে অর্ঘ্য। কী আশ্চর্য, সংকোচের বদলে যেন একটু ভরসাই পেল অহনা।

ঠান্ডা গলায় অহনা বলল, "কেন তুমি এখনও আমার ওপর অত্যাচার চালাচ্ছ? কী করলে আমায় নিষ্কৃতি দেবে?"

"তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি...।" সুগতর স্বর গম্ভীর, "ফিরে চলো কলকাতায়। আবার নতুনভাবে জীবনটা শুরু করি।"

“তুমি তো ভাল মতোই জানো সেটা সম্ভব নয়।... টাকার জোরে ডিভোর্সের মামলা তুমি ঠেকিয়ে রাখতে পারো, কিন্তু আমি যা ছেড়েছি তা চিরকালের জন্যই ছেড়েছি।”

“সে তো তোমার ছ’বছর আগের ডিসিশন। তারপর তোমারও বয়স বেড়েছে, আমারও। এখন কি আমাদের কারও আর মাথা গরম করা সাজে!” সুগত থামল। বুঝি বা পড়তে চাইল অহনাকে। তারপর গলাটা সামান্য নরম করে বলল, “ডিভোর্স যে তোমাকে দিতে চাইনি তা তো অকারণে নয় অহনা। আমি বিশ্বাস করি একদিন না একদিন আমাদের ভুল বোঝাবুঝির পালা শেষ হবে, আবার আমরা...”

“স্টপ দিস ননসেন্স।” অহনা দুম করে চেঁচিয়ে উঠল, “কীসের ভুল বোঝাবুঝি? পরের পর অন্যায় করে গেছ, থামাতে চেয়েছি, শোনোনি। যা খুশি নোংরামি করে গেছ, চোখের ওপরে, আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করোনি। যেই না প্রতিবাদ করেছি, ওমনি প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছ আমাকে।”

“থাক না ওসব পুরনো কথা। ভুল তো আমি করেইছি।” সুগত গলা ঝাড়ল, “তবে তুমিও তখন বড্ড টাচি হয়ে গিয়েছিলে, নয় কি? আমি তোমার কোনও অভাব রেখেছিলাম, বলো?... অত বড় একখানা ফ্ল্যাট, শুধু তোমার ব্যবহার করার জন্যে একটা গাড়ি... খরচ করার জন্য অঢেল টাকা... যেভাবে খুশি ওড়াও, কেউ কোনও প্রশ্ন করবে না...। তবু তুমি সেই মিডলক্লাস পিটপিটানি শুরু করলে...”

“আমি তো এখনও সেই রকমই আছি। কেন আসো আমার কাছে? আমি বদলাইনি। সরি, তুমি তোমার টাকা নিয়ে, মেয়েমানুষ নিয়ে, যেভাবে খুশি থাকো। ঈশ্বরের দোহাই, শয়তানের দোহাই, আমাকে আর ডিস্টার্ব কোরো না, প্লিজ়।”

মিনিট খানেক ঘর নিস্তব্ধ। এতই শব্দহীন, মাথার ওপর পাখা ঘোরার আওয়াজও যেন উচ্চকিত লাগে। আচমকাই সুগতর মুখমণ্ডল বদলে গেছে। রাজকীয় ভঙ্গিমা ছেড়ে ঝুঁকেছে টেবিলে। আবার একখানা সিগারেট ধরিয়ে টানছে ফসফস। সেটাও নিভিয়ে দিয়ে করুণ স্বরে বলল, “আমার বড় বিপদ অহনা। এই সময়ে তুমি পাশে না থাকলে...”

“ঢং কোরো না।” অহনা একটুও গলল না, “তোমার আবার কীসের বিপদ? টাকার পাহাড়ে বসে আছ, মুশকিল আসানও তো তুমি তুড়ি মেরে কিনে নিতে পারো।”

“না অহনা, না। তুমি বুঝতে পারছ না। আমি এখন আগ্নেয়গিরির মুখে বসে আছি।”

“হোয়াট?”

“টাকাপয়সা কালেক্ট করে যে ক’টা বিজনেসে লাগিয়েছিলাম, সব ডুবে গেছে। আমার লোকেরাই ডুবিয়েছে। কত লাখ টাকা আমার নাম করে তুলেছে এজেন্টরা, জমাই পড়েনি। যাদের টাকা ফেরত দেওয়ার কথা তারা এখন তাগাদা দিচ্ছে। আমি যে কীভাবে কী করব...”

“তাতে তো তোমার ঠাঁটবাটের কিছু কমতি দেখছি না। গাড়িটা গত সপ্তাহে কিনেছ বললে না?”

“তুমি তো মানি মার্কেটের ব্যাপার-স্যাপার বোঝো অহনা। টাকা আসছিল বলেই স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং একভাবে চলছিল। এখন যদি সেটা হঠাৎ বদলাই, সঙ্গে সঙ্গে বাজার বুঝে যাবে আমার কী হাল। ওমনি চারপাশটা ক্র্যাশ করে যাবে।”

“পন্‌জি সিস্টেমের এটাই তো নিয়ম। তোমাকে তো আগেও বলেছি।”

“ভেবেছিলাম আমি একটা এক্সেপশন। হয়তো সারভাইভ করে যাব। সুগত ঢোক গিলল। মৃদু গলায় বলল, হয়তো এখনও পারি। যদি বিশ্বাস করার মতো কেউ একজন পাশে থাকে... আমাকে গাইড করে...”

“আছে তো। তোমার সেই চন্দ্রাণী।”

“আহ, ডোন্ট টক অ্যাবাউট দ্যাট ডার্টি হোর।”

“খবরদার। আমার বাড়িতে বসে কোনও মেয়ের সম্পর্কে নোংরা মন্তব্য করবে না।” অহনা প্রায় গর্জে উঠল, “ওই মেয়ের সঙ্গেই না তুমি থাকতে এক সময়ে! বিজনেস বাড়বে বলে তাকে আনলে, তারপর

তুমিই তাকে বিছানায় তোলোনি? সটান বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমার মুখের সামনে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দাওনি? সে যদি হোর হয়, তবে তুমি কী? ক্রিমিকীট? না নর্দমার পোকা?”

“তুমি জানো না অহনা, চন্দ্রাণী আমাকে কীভাবে চিট করেছে। কত পারসোনাল অ্যাসেট বানিয়ে ফেলেছে, আমায় টের পেতে দেয়নি।... তুমি শুধু আমার সঙ্গে চলো, দেখবে ওকে আমি কেমন লাথি মেরে তাড়িয়ে দিই।”

রাগে বিরক্তিতে রগের শিরা দপদপ করছিল অহনার। তবু কেন যে অহনা হেসে ফেলল! বিদ্রূপের সুরে বলল, “সে এখনও আছে তা হলে? তোমার সঙ্গে?”

“উপায় কী? ও ব্যাবসার এত কিছু সিক্রেট জেনে ফেলেছে...।” সুগত অস্থির ভাবে দু’হাত ঝাঁকাল, “তাই তো বলছি তুমি চলো। আমি যদি একটু ভরসা পাই তা হলে ওকে...”

“আমার মতো করে বিদেয় করতে পারো, তাই তো? তারপর চন্দ্রাণীর পরিবর্তে আমাকে সেই সার্ভিসটা দিতে হবে? বোথ ইন বেড অ্যান্ড বিজ়নেস!”

“কী বলছ তুমি? কোথায় তুমি আর কোথায় চন্দ্রাণী? তুমি হলে আমার বিয়ে করা বউ আর সে একটা...। তোমার মাকেও আমি বলেছি, তোমার সম্মান আর আমি ক্ষুণ্ণ হতে দেব না। সোনাদানা দলিল দস্তাবেজ কিচ্ছু আর ওই নচ্ছার মেয়েমানুষটার জিম্মায় রাখব না। সব চলে আসবে তোমার কাছে।”

আবার অহনার ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। সুগত সেই একই রকম আছে। নিজের স্বার্থজ্ঞান টনটনে। কোনও একটা ধান্দায় এখন চন্দ্রাণীকে ছেড়ে অহনাকে দরকার। সম্ভবত দু’ নম্বরি কারবারে অহনাকে বেশি নিরাপদ সহযোগী ভাবছে। মা ওসব আহ্লাদিপনায় ভুলতে পারে, কিন্তু অহনা তো বহু বছর আগেই বুঝে গেছে, মাংসলোলুপ ওই সুগতর চোখে তার আর চন্দ্রাণীর কোনও তফাত নেই।

অহনা রূঢ় স্বরে বলল, “তুমি ডিভোর্স দাও না দাও, তোমার সঙ্গে সব চুকেবুকে গেছে। সে সিদ্ধান্তের আর নড়চড় হবে না।”

“কেন এক জেদ আঁকড়ে আছ? বি সেন্সেবল।” আবার একটা সিগারেট ধরাল সুগত। বছর পঁয়তাল্লিশের সুদর্শন মানুষটার চকচকে মুখখানা বেশ নিষ্প্রভ এখন। সিগারেট ধরা আঙুলগুলো যেন কাঁপছে অল্প অল্প। কেমন ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, “তুমি যা বলবে, যেভাবে চাইবে, সেভাবেই নয় বদলাব নিজেকে।”

“হাসিয়ো না। আমি বললেই ওমনি আপাদমস্তক জালি সুগত চৌধুরী সাধুসন্ত বনে যাবে!”

“চেষ্টা তো করতে পারি। ব্যাবসার ঝাঁপ গুটিয়ে দু’জনে মিলে নয় অন্য কোথাও চলে যাব। যেটুকু যা থাকবে, তাতেই আমাদের বাকি জীবনটা স্বচ্ছন্দে...”

ওফ, সেই দু’ নম্বরি চিন্তা। রাশি রাশি লোককে পথে বসিয়ে পালানোর তাল করছে নাকি? আর অহনা তার সঙ্গী হবে? ভাবল কী করে সুগত?

ধারালো গলায় অহনা বলল, “তোমার কোনও মতলববাজিতে আমি ভুলছি না। তুমি কী করবে না করবে তা তুমি ভাবো। আমি তোমার সঙ্গে নেই, থাকবও না কোনও দিন। মা দাদা বউদি যাকে খুশি জপাতে পারো, আমার সিদ্ধান্তে নড়চড় হবে না।”

“একটু ভাবো। ক’দিন সময় নাও।”

“না। এবং কোনও অছিলাতেই তুমি আর আলাইপুরে আসবে না। বিয়ের পর কয়েকটা বছর তো আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। জ্ঞানত আমি তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। কোনও মেটিরিয়াল লস ঘটাইনি। তার বিনিময়ে এইটুকু তো পেতে পারি। শান্তিতে তোমাকে ঘেন্না করার সুযোগটুকু অন্তত দাও।”

সপাং করে যেন চাবুকের ঘা পড়ল সুগতর গায়ে, কেঁপে উঠল সোফায় আসীন দেহকাণ্ড। ঝলসে উঠল সুগতর চোখের মণি। তর্জনী উঁচিয়ে কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। ঘাড় নামিয়ে বসে রইল মিনিটখানেক। তারপর উঠে দাঁড়িয়েছে। বিড়বিড় করে বলল, "একটু বাথরুমে যেতে পারি?"

বারণ করতে পারল না অহনা। এবং যে আশঙ্কাটা পিনপিন করছিল মাথায় সেটাই ঘটল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সুগতর দৃষ্টি আটকেছে অর্ঘ্যর ঘরে। একটুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে এল পায়ে পায়ে।

ভুরু কুঁচকে বলল, "ও কে?"

পলকের জন্য থমকে গিয়েছিল অহনা। কেন যে...? পরক্ষণে অবশ্য কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে স্বাভাবিক।

পালটা ভুরু কুঁচকে বলল, "জেনে কী করবে?"

"ও কি এখানেই থাকে?"

"দেখতেই তো পাচ্ছ, আছে। বাড়তি প্রশ্ন কোরো না, জবাব পাবে না।"

"এখানে যে কেউ একজন থাকে... কই, মা তো কিছু বললেন না...?"

"প্রয়োজনবোধ করেনি। তোমার বাড়িতে তুমি কাকে এনে তোলো, রাখো, মাকে জানিয়েছ কখনও?"

"ও।"

নিজের মনেই মাথা দোলাল সুগত। তারপর চলে গেল। বুঝি বা একটু দ্রুতই। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতে একটু বুঝি বেশি সময় লাগল। আশাবরীর চৌহদ্দি ছেড়ে আস্তে আস্তে মিলিয়েও দেল দুধসাদা।

অহনা সোফা ছেড়ে নড়েনি। বসে ছিল কপাল টিপে। বুঝি শান্ত করছিল রক্তকণিকার অবাধ্য ছোটাছুটি। চোখ না তুলেই টের পেল অর্ঘ্য এসেছে।

অর্ঘ্যর স্বর কানে এল, "আই অ্যাম সরি অণুদি।"

অহনা মুখ তুলল, "কেন?"

"ঘরের দরজাটা বন্ধ রাখলেই বোধহয় ভাল হত। ভদ্রলোক এমন ভাবে দেখছিলেন..."

“তাতে আমার কী এসে যায়?” অহনা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, “আমি কি ওকে কেয়ার করি?”

“তবু... যা সত্যি নয়... হয়তো তেমন একটা ধারণা নিয়ে চলে গেলেন।”

কোনটা সত্যি, আর কোনটা যে সত্যি নয়, কে বলতে পারে? অহনাও কি জানে ঠিকঠাক? এ বাড়িতে অর্ঘ্যর ক’দিনের উপস্থিতি যে তাকে একটা অন্য ধরনের পুরুষের সাহচর্য দিচ্ছে, সর্বদা অহনার স্মরণেও থাকছে না অর্ঘ্য তার বান্ধবীর ভাই, এই সত্যিটাকে কি অহনা অস্বীকার করতে পারে জোর গলায়?

অহনা ঠোঁট উলটে বলল, “ছাড় তো। ভাবুক যা খুশি।”

কৃষ্ণা ঢুকছে হেলেদুলে। দু’জনকে একসঙ্গে বাইরের ঘরে দেখে একটু যেন অপ্রস্তুত। কাঁচুমাচু মুখে বলল, “চায়ের জন্য বসে আছ, না?”

কৃষ্ণার দেরিতে আসায় অহনা স্বস্তিই পেয়েছে। তবু গম্ভীর সুরে বলল, “দয়া করে তাড়াতাড়ি জলটা চড়াও।”

কৃষ্ণা প্রায় দৌড়োল রান্নাঘরে। সে দিকে তাকিয়ে অহনা হাসিহাসি মুখে বলল, “তা কী বুঝলি আজ, অ্যাঁ?”

অর্ঘ্যর চোখ পিটপিট, “কী ব্যাপারে বলো তো?”

“আমরা তো কেউ আস্তে কথা বলছিলাম না। সবই তো গিলেছিস নির্ঘাত। লোকটাকে কেমন টাইট দিলাম বল?”

“একটা কথা বলব? রাগ করবে না?”

“কী?”

“ভদ্রলোককে এতটা হিট না করলেই পারতে।”

“বেশ করেছি। জানিস ও আমায় কত জ্বালিয়েছে?”

“হতে পারে। তবে এও তো হতে পারে, তোমার হাজ়ব্যান্ডের মধ্যে একটা চেঞ্জ এসেছে? গলার স্বর শুনে যথেষ্ট বিচলিত মনে হচ্ছিল। হয়তো সত্যি আন্তরিক ভাবে চাইছেন...”

“থাম তো। ওকে তুই কতটুকু চিনিস? কথা দিয়েই তো লোককে মোহিত করেছে চিরকাল।” অহনার গলায় ঝাঁঝ, “কথার কায়দায় ভুলেই তো আমি ফেঁসেছিলাম।”

“তাই বুঝি?”

“না তো কী। প্রথম ওর সঙ্গে মোলাকাত আমাদের বাড়িতে। বাবা কোল ইন্ডিয়ার বড় অফিসার ছিল, তুই তো জানিসই। সুগত বাবার কাছে এসেছিল। বাবাকে দিয়ে কিছু ইনভেস্ট করাতে। শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড, চার-পাঁচটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানির ব্রোকারি, একসঙ্গে চালাত। পরিচয় দেওয়ার সময়ে বলত, আমি হেঁজিপেঁজি দালাল নই, বিনিয়োগ পরামর্শদাতা। কার্ডে লেখা থাকত, ইনভেস্টমেন্ট কন্সালটেন্ট। কত যে ডিগ্রি ডিপ্লোমার লিস্ট ছিল সেই কার্ডে।”

“অর্থাৎ প্রচুর পড়াশোনা করা মানুষ।”

“তুৎ, সব মিথ্যে। মানুষটাই তো ভুয়োর ডিপো। তবে কথাবার্তায় অতি অতি চৌখস। তখনই সুট-প্যান্ট-টাই পরত। ফিল্মস্টারদের মতো ঝকঝকে চেহারা, এখন তো তাও মাথার সামনেটা অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে, তখন চুলের কী বাহার, মুখে অনর্গল ইংরিজির খই ফুটছে... এমন ভাবে বোঝাবে, মনে হবে সর্বস্ব এর হাতে তুলে দেওয়া যায়। তবে বাবা ছিল হার্ড নাট টু ক্র্যাক। সুগতকে তাই আসতে হচ্ছিল বারবার। শেষমেশ বাবা বোধহয় কিছু টাকা রেখেছিল, কিন্তু আমি তদ্দিনে পুরো মোহিত হয়ে গেছি। সুগতর দিক থেকেও সাড়া পেয়ে আমি তো আত্মহারা। এম.এস.সি করে তখন সবে নেটে বসব বসব ভাবছি, ও হঠাৎ তাড়া লাগাতে শুরু করল বিয়ের জন্য। বাবা তখনই আমাকে সাবধান করেছিল। বলত, সুগতর ভেতর একটা মেকি ব্যাপার আছে, ওর দেখনদারিতে ভুলিস না...। কানে তুললাম না। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা অগ্রাহ্য করে সেরে ফেললাম বিয়েটা। প্রথম তিন-চার মাস তো কিছুই টের পাইনি।

দিব্যি একটা সাজানো গোছানো ফ্ল্যাটে নিয়ে তুলল আমায়। আমিও সুখের সাগরে ভাসছি। তারপর তো বিকশিত হল বাবুর স্বরূপ। যে বাবা মা ভাই টাইকে দেখেছিলাম সুগতর, তাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই, শুধু ওই দিনগুলোতে কোনওভাবে পটিয়ে পাটিয়ে বরানগরে এনে রেখেছিল। কয়েকটা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মেম্বরশিপ ছিল, সেগুলোকেই ডিগ্রি বলে চালাত। আদতে লেখাপড়ার দৌড় মোটে বি.কম।”

“ও...তার মানে তোমায় ঠকিয়ে বিয়ে করেছিল?”

“সুগত তা কখনই মানতে চায় না। বলে, তুমি যদি আমার সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে নাও, তার জন্য আমি দায়ী? তখন মনে হয়েছিল যুক্তিটা মিথ্যে নয়। ও তো কখনও গলা ফুলিয়ে দাবি করেনি, বোঝার ভুলটা আমারই গলতি।”

কৃষ্ণা চা বিস্কুট দিয়ে গেছে। অর্ঘ্য কাপ টানল। বিস্কুট চিবোতে চিবোতে নিচু গলায় বলল, “তারপর বুঝি ওই মহিলা... কী যেন নাম...”

“না রে। সে অনেক পরে। তার ঢের আগে থেকেই আমাদের সম্পর্কটা...।” অহনা দূরমনস্ক মুখে চুমুক দিল চায়ে, “হঠাৎ একদিন শুনলাম, ও আর অন্য কোম্পানির কাজ করবে না, নিজেই কারবার খুলবে। যারা যারা ওর টিমে কাজ করত, তাদের নিয়ে। কী ব্যাবসা? এক বছর, দু’ বছর, পাঁচ বছর, দশ বছরের জন্যে টাকা ফিক্সড ডিপোজিট রাখবে, চড়া সুদ সমেত ফেরত দেবে সময় মতো। বিশেষ কায়দায়। বেশি সময়ের জন্য যারা রাখবে, তাদের টাকার একটা অংশ দিয়ে যারা কম সময়ের জন্য রাখছে, তাদের টাকাটা মিটিয়ে দেবে। আর বছরের পর বছর ব্যাবসাটা চলতে থাকলে লং টার্ম ডিপোজ়িটারদের ফেরত দেওয়ার কোনও সমস্যা নেই। টাকার একটা অংশ রিয়েল এস্টেটে লাগাবে, জমি কিনবে বেচবে, তাতেই নাকি লাল হয়ে যাবে সুগত।”

“তা হয় নাকি? ওভাবে টাকা তোলা, চড়া সুদ দেওয়া তো একেবারে বেআইনি।”

“সে তো জানি। তা ছাড়া ওটা অসম্ভবও। অঙ্কে তো আমি নেহাত মূর্খ নই, হিসেব কষে ওকে দেখিয়েও দিলাম। পাত্তাই দিল না, উলটে রেগে গেল। নেমে পড়ল বিজ়নেসে। কী কাণ্ড, ওর ক্যারিশমার জোরে হোক, কী ওর টিমের কেরামতি, হু হু করে টাকা আসতে লাগল। স্যাটাস্যাট ফ্ল্যাট কিনছে, গাড়ি কিনছে, আর আমি শিউরে শিউরে উঠছি। অন্য নেশাও ধরল ক্রমশ। আগে ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করত... শুরু হল বেহেড মাতলামি। যত্র তত্র পড়ে থাকা, আজ এই হোটেলে রাত কাটাচ্ছে তো কাল ওই হোটেলে...। এবং একলা নয়, সর্বদাই কোনও নর্মসহচরী মজুত। এতই নির্লজ্জ সেটা আবার সগর্বে ঘোষণা করে।”

“তখনই তুমি চলে আসোনি?”

“পারিনি আসতে। সংকোচে পা আটকে ছিল যে। শুধু মনে হত, বাপের বাড়ি ফিরলেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে, আমি হেরে গেছি। অবশেষে সিনে এন্ট্রি নিল চন্দ্রাণী। প্রথম প্রথম বলত, ও আমার বিজ়নেস এগজ়িকিউটিভ। তারপর ওকে নিয়ে এমন লোচ্চামি শুরু করল... ফিরে আসতেই হল একদিন। এমনই কপাল, একটু সুস্থির হয়ে বাঁচব তার উপায় নেই। বাবা দুম করে মারা গেল। দাদা তখন অবিরাম ঘ্যানাচ্ছে, ভুল করিস না। সুগত যাই করুক, যে ব্যাবসাই করুক, তার টাকায় তোর ন্যায্য অধিকার আছে, তোর পাওনা তুই ছাড়বি কেন...।”

“লাল্টুদা এ কথা বলেছিল?”

“দুনিয়ায় স্বার্থ বড় বিষম বস্তু রে। আলাইপুরের জমিবাড়ি বাবা আমার নামে লিখে দিয়েছে, যদি সুড়সুড়িয়ে সুগতর কাছে ফিরে যাই, তা হলে ক’দিন পরে দাদা এটাকে বেচার কথা বলতে পারে। আর বিক্রি হলে বোন কি দাদাকে বখরা দেবে না!” অহনার গলা সামান্য ধরা ধরা শোনাল, “সাধে কি বলি, জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে... ওই সব দেখেশুনেই না...”

অর্ঘ্য নিশ্চুপ। খোলা জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখছে। নাকি ভাবছে কিছু? হঠাৎ বলল, “তবু... মানুষ তো বদলায়... তোমার হ্যাজ়বেন্ডের হয়তো অনুতাপ এসেছে...”

“সুতরাং ফিরে গিয়ে তুমি তার সংসার করো!” অহনার মুখ বিদ্রূপে বেঁকে গেল, “তুই এটা বলতে পারছিস? এ কি সম্ভব? ওই আদ্যন্ত অসৎ ডিবচ লোকটার সঙ্গে আবার এক ছাদের নীচে কাটাব? স্রেফ পুরুষমানুষ বলে ও জগৎ সংসারের কাছে ছাড় পেয়ে যাবে? আমি তাকে ক্ষমা করব না। পদে পদে যে আমায় অপমান করেছে, আমার বিশ্বাস ভেঙেছে, তার সঙ্গে কীসের আপস?”

অর্ঘ্য আর কিছু বলল না। উঠে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে ঘরে। জীবনে এই প্রথম মনের কথাগুলো উগরে দিতে পেরে একটু যেন হালকা বোধ করছিল অহনা। যেন গুহার মুখে আটকে থাকা পাথরের চাঁই একটু একটু করে সরছে।

কেন অহনা এত কথা বলল অর্ঘ্যকে? অর্ঘ্য তার কে? সুগত যখন এল, কাকতালীয় ভাবে অর্ঘ্য উপস্থিত ছিল বলেই কি? নাকি অন্য এক অহনা ছটফট করছিল অর্ঘ্যকে শোনানোর জন্যে? কিন্তু অর্ঘ্যই বা সুগতর হয়ে ওকালতি করল কেন? নাকি পরখ করছিল অহনাকে? আশ্চর্য, কেন অহনার এমন মনে হচ্ছে?

অহনা বুঝতে পারছিল না। রাতে শুয়েও ঘুরে ঘুরে আসছিল ভাবনাটা। আধো তন্দ্রায় আরও নানান চিন্তা এলোমেলো পাক খাচ্ছে মাথায়। সুগত আজ ঠিক কেন এসেছিল? তাকে ফেরানোর জন্যই বা এত আকুল কেন? কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে সুগতর? সত্যি কি কোনও ঝামেলায়...? বড্ড সিগারেট খাচ্ছিল...

কীসের একটা শব্দ হচ্ছে না? ঘোরটা ছিঁড়ে গেল অহনার। হালতা রাতবাতি জ্বলছে ঘরে, কিন্তু কিছুই যেন ঠিক ঠিক ঠাহর হয় না। মশারি সরিয়ে নামল বিছানা ছেড়ে। টলমল পায়ে টিউব লাইটটা জ্বালাল। ফ্যাটফেটে আলোয় আওয়াজটা আরও যেন উচ্চকিত। অর্ঘ্যর ঘর থেকে আসছে কী?

হ্যাঁ, তাই তো। একটা গোঙানির শব্দ। যেন বোবায় ধরেছে অর্ঘ্যকে। দুঃস্বপ্ন দেখছে কি কোনও? অহনা ডাকতে যাচ্ছিল, ঝুপ করে থেমে গেল শব্দটা। আবার নিয়মিত লয়ে শ্বাস পড়ছে অর্ঘ্যর। অহনা স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে। এগোতেও পারছে না, পিছোতেও না। শিরশির করছিল বুকটা। হঠাৎই।

.

॥ ৯ ॥

দুপুরে খেয়েদেয়ে উঠে অর্ঘ্য একটু যেন ছটফট করছিল। সকাল থেকেই মন আজ ভারী উচাটন হয়ে আছে। কেন যে হঠাৎ হঠাৎ ধড়াস করে উঠছে বুকটা। তেমন কোনও বিশেষ কারণ ছাড়াই। এ কি কোনও বিপদের সংকেত? অনেক সময়েই মন নাকি আসন্ন সংকটের পূর্বাভাস পায়। ধুৎ, এ ধরনের আধিভৌতিক কিংবা দৈব ব্যাপারস্যাপারে কণামাত্র বিশ্বাস নেই অর্ঘ্যর। যে দর্শনে তার প্রগাঢ় আস্থা, তাতেও বলছে এসব স্রেফ মনগড়া কল্পনা। কিন্তু মন যে তার অসম্ভব চঞ্চল হয়ে আছে, তত্ত্বের দোহাই দিয়ে অর্ঘ্য সেটা উড়িয়ে দিতে পারছে কই?

কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই বলেই কি ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি চলছে অর্ঘ্যর? সকালেই অহনার মুখে শুনেছে, রাত্রে ঘুমের ঘোরেও নাকি অর্ঘ্যর গলা দিয়ে বিটকেল আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল...

নাহ, ফোনাফুনি একটু করতেই হবে আজ। বিজয় রত্নম নামের ভোটের কার্ডখানা দিয়ে নতুন একখানা সিম বানাল, এখনও ব্যবহারই হয়নি। নয়া নম্বরটা বেশ কয়েকজনকে দিয়ে রাখা দরকার।

কিন্তু ঘরে বসে তো শান্তিতে কথা বলা যাবে না। আজ অহনাদেবী বাড়িতে মজুত। একটু নিরিবিলি চাই, সামান্য নিভৃতি। সুখের বিষয়, এমন জায়গার এখনও অভাব ঘটেনি আলাইপুরে।

মোবাইল পকেটে নিয়ে, চটি গলিয়ে অর্ঘ্য বেরোতে যাচ্ছে, পিছন থেকে অহনার ডাক, “চললি কোথায়?”

অর্ঘ্য দাঁড়িয়ে পড়ল। আলগা ভাবে বলল, “সকাল থেকে বসে আছি, যাই একটু হেঁটে আসি।”

“এই দুপুরবেলা টো টো করবি?”

“কোথায় দুপুর? প্রায় তিনটে বাজে। বাইরে তো রোদও নেই খুব একটা।”

“বেশি দেরি করিস না। বিকেলে বেরোব একটু। তোকে নিয়ে।”

“কোথায়?”

“তোকে সাইট সিয়িং করাব।”

“মানে?”

“পরে তো আমার নিন্দে করবি, এতদিন রইলাম অণুদি নিজে আমাকে আলাইপুরের আশপাশটাও ঘুরে দেখাল না। চল, তোতে আমাতে আজ চরে যাব।”

“কোন চর?”

“নদীর চর। গঙ্গার মাঝখানে যেটা গজিয়েছে।”

“কী আছে ওখানে? এনিথিং স্পেশাল?”

“জানি না। বহুকাল আগে, সেই যখন এলাম, ওখানে গিয়েছিলাম একবার। তখন বিলকুল ন্যাড়া ন্যাড়া ছিল। এখন তো দেখি সবুজে ছয়লাপ। প্রচুর পিকনিক পার্টিও যায় শীতকালে।” বলতে বলতে অর্ঘ্যকে লঘু ধমক দিল অহনা, “গিয়েই দেখবি কী আছে না আছে। আমার সঙ্গে বেড়াতে কি তোর আপত্তি আছে?”

অর্ঘ্য হেসে ফেলল, “না না, যাব।”

বেরিয়ে এল অর্ঘ্য। চলতে চলতে মনে হল, তার সঙ্গ যেন একটু বেশিই পছন্দ করছে অণুদি। যতটা না ভাইয়ের মতো, তার চেয়ে বেশি বন্ধুর মতো। তারও কি অণুদিকে এখন দিদি গোছের কিছু মনে হচ্ছে। উঁহু। জীবনে এই প্রথম যেন কোনও নারীর সৌরভ পাচ্ছে অর্ঘ্য। যা মা-দিদিদের মতো নয়, সহপাঠীদের মতো নয়, তার মহিলা কমরেডদের মতো তো নয়ই। এই ঘ্রাণ যেন সম্পূর্ণ আলাদা। নিজের সুখ-দুঃখ,

গোপন কষ্ট কী অকপট ভাবে বলছে তাকে। মতামত চাইছে। কখনও দুঃখে ভেঙে পড়ছে, আবার অর্ঘ্যর ওপর নির্ভর করেই সুস্থিত হচ্ছে কখনও কখনও। সব মিলিয়ে এক অন্য ধরনের অনুভূতির স্বাদ মিলছে যেন। কী বলে একে?

এই অর্ঘ্য, তুই প্রেমে টেমে পড়ে যাচ্ছিস না তো? মাত্র কয়েক দিন ফাঁকা বাড়িতে এক নিঃসঙ্গ মহিলার সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে তোর জ্ঞানগম্যি লোপ পেল নাকি? দেখিস বাবা, যুক্তিবুদ্ধির অসুখে পড়ে যায় না যেন। বিপ্লবীকে ওটা মানায় না।

আপন মনেই অর্ঘ্য হাসল একটু। যে তিরতিরে অজানা উদ্বেগে ভুগছিল এতক্ষণ, তা যেন কমেছে খানিকটা। ইটভাঁটা পেরোল অর্ঘ্য। আশাবরী থেকে তাকে আর চোখেই পড়বে না। রোববার বলেই জায়গাটা আজ বড় বেশি নির্জন। একফালি ছায়া খুঁজে নিয়ে অর্ঘ্য বসল নিশ্চিন্তে। কাকে ফোন করবে প্রথমে? রাজন? তেজস কী মতলব ভাঁজছে জানাটা ভীষণ জরুরি। কিন্তু তার আগে একবার আসানসোলের খোঁজ নেবে না?

আগে বাবার নম্বরটাই টিপল অর্ঘ্য। বাজছে, বাজছে। বেজে বেজে থেমে গেল। আবার টিপল নম্বরটা। বেজেই গেল ফোন, ধরল না কেউ।

কী হল ব্যাপারটা? বাবা মোবাইলের ধারেকাছে নেই নাকি? এমন অবশ্য হয় মাঝেসাঝে। একটু চিন্তা করে অর্ঘ্য ল্যান্ডলাইনে ফোন করেছে। বেশি ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে, অন্য কেউ ধরতে পারে ফোন, তবুও...।

নাহ, কপাল ভাল। বাবাই তুলেছে, “হ্যালো?”

“বাবা, আমি খোকা।”

“ওমা, তুই? তোকে পরশু সন্ধে থেকে খুঁজছি, সারাক্ষণ সুইচড অফ...”

বাবার উদ্বিগ্ন গলা শুনে একটু যেন কেঁপে গেল অর্ঘ্য। জিজ্ঞেস করল, “মা আছে কেমন?”

“তার তো যা সর্বনাশ হওয়ার হয়ে গেছে। স্ক্যানের রিপোর্ট খুব খারাপ। ব্রেনে তিন-চার জায়গায় ব্লাড ক্লট করেছে।”

“অপারেশন করাতেই হবে?”

“কাল একজন স্পেশালিস্টের সঙ্গে কথা হল। উনি কোনও ভরসা দিতে পারলেন না। বলছেন অপারেশন খুব রিস্কি, বরং মেডিসিন দিয়ে ট্রাই করা যেতে পারে। সময় বেশি লাগলেও রিকভার করার চান্স আছে। তোর দিদি তো কাল জামশেদপুর থেকে এসেছে। থাকবে কিছুদিন। তোর মা অবশ্য ওকেও চিনতে পারছে না। চোখটা খোলা, জ্ঞানটা আছে, এইটুকু যা সান্ত্বনা।”

অর্ঘ্যর মুখে কোনও কথা ফুটল না। একটা মৃদু ধ্বনি বেরোল শুধু, “ও।”

“যে জন্যে তোকে আমি খুঁজছিলাম...” অরবিন্দের গলা সহসা খাদে, “পরশু বিকেলে... কে কী খবর দিয়েছে জানি না... দুই পুলিশ অফিসার বাড়িতে হাজির। লোকাল থানার নয়, বেশ হোমরাচোমরা গোছের।”

সেই অস্ফূট ধ্বনিই ফুটল আবার, “ও।”

“তারা প্রায় দু’ ঘণ্টা ছিল বাড়িতে। অনেক অনেক জেরা করল। তুই কোথায় পড়তিস, কতদিন বাড়িছাড়া, শেষ কবে বাড়িতে এসেছিলি, তোর কোন কোন বন্ধুবান্ধবকে আমি চিনি, তাদের কারও ঠিকানা জানি কিনা... তোর মা’র অবস্থা দেখে বোধহয় দয়া হল, নইলে আরও কতক্ষণ যে আমায় রগড়াত, কে জানে।” অরবিন্দের গলা একটু যেন বেশিই ভারী শোনাল, “এক দিকে তোর মা, অন্য দিকে তুই, কী জ্বালায় যে ভগবান ফেললেন আমায়... জানি না জীবনে কী পাপ করেছিলাম।..”

সরল আক্ষেপ, কিন্তু বিষাক্ত তিরের মতোই কথাগুলো বিঁধছিল অর্ঘ্যকে। যেন বাবাকে থামানোর জন্যই বলে উঠল, “এখন তো তা হলে কোনও ভাবেই আমি আসানসোলে যেতে...”

“ভুলেও ও চেষ্টা করিস না। আমার ধারণা, পুলিশ আমাদের বাড়ির ওপর ওয়াচ রাখছে।” অরবিন্দের গলা থেকে ক্ষোভ ঠিকরে এল, “না রাখলেই বা কী? সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। মায়ের এই ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে তুমি বাড়তি কোনও উপদ্রব না বাধালেই আমি কৃতজ্ঞ থাকব।”

“মনে থাকবে উপদেশটা।”

“আমার কত উপদেশই না মনে রেখেছ!” অরবিন্দর হতাশ সুরে বুঝি বা বিলাপ এসে মিশল, “কোথায় কোথায় মানুষ মেরে কী দেশোদ্ধার করছ জানি না, কবে যে নিজেও তুমি গুলি খেয়ে মরে পড়ে থাকবে, সেই খবরও বুড়ো বোকা বাপটাকে গিলতে হবে... তাও জানি না। তবে পুলিশ যখন একবার আসা শুরু করেছে, তখন সে বারবার আসবে, আমাদের উত্যক্ত করবে... যতক্ষণ না তোমার সন্ধান পায়। তদ্দিন অত্যাচার তো আমায় সইতেই হবে... তোমার বাপ হওয়ার মাশুল তো গুনতেই হবে...”

সহ্য হচ্ছিল না অর্ঘ্যর। বাবা তো প্রলাপ বকছে না, সশস্ত্র ব্যাটেলিয়নের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে যেন গুলি ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। বিদ্ধ করছে যত্রতত্র।

গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং মাফিক আড়াল খুঁজল অর্ঘ্য। বলল, “বেশিক্ষণ ফোনে কথা বলা সেফ নয়। আজ রাখছি।”

“এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড।” অরবিন্দের স্বর ঝাপটে এল কানে, “তুমি কিন্তু আমার মোবাইলে আর কল কোরো না।”

“কেন?”

“পুলিশ আমার মোবাইল সিইজ় করেছে। সিম বদলে ভাল করেছ, নইলে হয়তো... আমি অবশ্য সব সময়েই তোমার কল মুছে দিয়েছি... তোমার নম্বরটাও ওতে নোট করা নেই... তবু সাবধান থাকাই তো...”

কথা ফুরোনোর আগেই বাটন টিপেছে অর্ঘ্য। কেটে গেল ফোন। হৃত্‌পিণ্ড তড়াক তড়াক লাফাচ্ছে। এইমাত্র বাবার মোবাইলেই রিং করেছিল...! অর্থাৎ, তার এই নম্বরটাও হয়তো এখন পুলিশের কবজায়। আগের নম্বরের শেষ কলগুলো থেকে যে টাওয়ার লোকেশন মিলবে, নতুন নম্বরেও তো সেখান থেকেই...

উদাসীন প্রকৃতি মানুষের বিপদ আপদের হদিশ রাখে না। মনোরম একটা বাতাস পাঠাচ্ছে নদীর দিক থেকে। ভিজে ভিজে। ঠান্ডা ঠান্ডা। চিলতে মেঘে ঢাকা পড়েছে সূর্য, ভারী মায়াময় আলোয় সেজে উঠছে আলাইপুরের বিকেল।

অর্ঘ্য ঘামতে শুরু করল। রাজনকে আর ফোন করা যাবে না, রাজনও বিপদে পড়ে যেতে পারে। ধরা পড়ার সম্ভাবনাও যেন বেড়ে গেল অনেকটা। আর কি আলাইপুরে ডুব মেরে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ? যত জলদি জলদি সম্ভব কেটে পড়াই তো শ্রেয়। পারলে কালই। উঁহু, কাল কেন, আজই নয় কেন? যত দেরি করবে, ততই তো বাড়বে বিপদের আশঙ্কা।

কিন্তু এক্ষুনি সে যাবে কোথায়? কলকাতার ডেরাটায় এক দু'দিনের জন্য উঠতে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়। মেসের মালিক তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল, এবার হয়তো পুলিশ লেলিয়ে দেবে। একটু ভদ্রস্থ গোছের কোনও বাড়িতে পেয়িংগেস্ট থাকবে, সেও তো আর পেরে উঠবে না। হাতে টাকাপয়সা বেশি নেই যে। তা ছাড়া আইডেন্টিটি হ্যাঙ্গামা তো থাকছেই। সোর্স অবশ্য একটা আছে কলকাতায়, গেলে কিছু মালকড়িও মিলতে পারে, কিন্তু সে তেজসের লোক। তার কাছে যাওয়া মাত্র অর্ঘ্যর অবস্থান জেনে ফেলবে তেজস। বাবার কাছে পুলিশ পাঠানোর বদমাইশিটা কে করল? তেজস? পুলিশের মধ্যেও তাদের পার্টির ইনফর্মার আছে। তাদের কারও মাধ্যমেই কি তেজস পৌঁছে দিয়েছে অর্ঘ্যর আসানসোলের ঠিকানা? অসম্ভব নয়, পার্টির পূর্ণ কন্ট্রোল পাওয়ার জন্য যেভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির শেষ মিটিং-এ ব্যক্তি হত্যার নীতি থেকে সরে আসতে বলেছিল অর্ঘ্য, তার

অনুগামীও কম ছিল না। ভোটে হেরে যাওয়ার ভয়ে প্রস্তাবটাই সুকৌশলে বানচাল করে দিল। এত বড় সিদ্ধান্ত নাকি ক'জনে মিলে বসে নেওয়া যায় না, প্রতিটি সদস্যের মতামত যাচাই করা দরকার। সে ভোটেও তেজস হারবে জানে বলেই বোধহয় অর্ঘ্যকে বেমালুম ছেঁটে ফেলতে চাইছে।

ভাল লাগে না। ভাবতেও ভাল লাগে না। মানুষের ভাল করতে এসে নিজেদের মধ্যে লড়াই, এর চেয়ে কুত্সিত আর কী আছে! তারা সব্বাই একই আদর্শে বিশ্বাসী। একটা শোষণহীন সমাজ দেখতে চায়। অথচ মতে সামান্য অমিল হলেই একে অপরের শত্রু! অর্ঘ্যর তো এখন বেশ মনে হচ্ছে তাদের লক্ষটা স্রেফ উপলক্ষ। আসলে অস্ত্রশস্ত্রের জোরে ছোট ছোট এলাকার সম্রাট হওয়াই বুঝি স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্টি নেতাদের। দুলাল সেদিন ভুল বলেনি। ক্ষমতা পেলে তাদের পার্টিও হয়তো দুলালদের বাধ্য চাকর বাকরই বানিয়ে ছাড়বে। অর্ঘ্য কি এটাই চেয়েছিল?

অর্ঘ্যর ফুসফুস নিংড়ে একটা বাতাস বেরিয়ে এল। শিথিল পায়ে ফিরছে আশাবরীতে। নাহ, কলকাতা সে যাবে না। আরও দূরে কোথাও পাড়ি জমাবে। জঙ্গলমহল নয়, ঝাড়খণ্ড নয়, আরও দূরে কোথাও। কিন্তু টাকা? অণুদির কাছে চাইবে? মিলতেও পারে। কিছু একটা গুলতাপ্পি দিতে হবে, এই যা।

অজান্তেই এক চিলতে করুণ হাসি ফুটে উঠল অর্ঘ্যর মুখে। সে নাকি সত্যের সাধনায় নেমেছে, মহান আদর্শের জন্য জীবন উত্সর্গ করাই নাকি তার ব্রত, অথচ পদে পদে তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়! মিথ্যের রাস্তা ধরে আদৌ কি সত্যে পৌঁছোনো যায়?

আনমনা অর্ঘ্য কখন যে আঙিনা পেরিয়ে পৌঁছে গেছে বাড়ির দরজায়। গ্রিলগেট ঠেলতেই অহনার গলা উড়ে এল, "সেই দেরি করলি তো? বিকেল যে প্রায় ফুরিয়ে এল!"

"সরি।"

বলতে বলতে বসার ঘরে ঢুকেছে অর্ঘ্য। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ছলাৎ।

হ্যাঁ, হৃদয়ে ঢেউ তোলার মতোই সাজগোজ করেছে অহনা। সালোয়ার কামিজের বদলে পরনে আজ মেরুন রঙ সিল্কের শাড়ি, শুকনো শুকনো মুখখানায় সুষমা এনেছে প্রসাধনে। মাপসই ওষ্ঠরঞ্জনী, কপালে ছোট্ট টিপ, আর লম্বা বিনুনিতে সে যেন অন্য মানবী আজ। পারফিউম মেখেছে কি? একটা মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভাসে যেন? অচেনা কোনও ফুলের সুরভি?

অহনা মুচকি হেসে বলল, "প্যাটপ্যাট করে কী দেখছিস, অ্যাঁ?"

"ম্যাজিক।" অর্ঘ্য দু' আঙুলে তারিফের মুদ্রা ফোটাল, "দারুণ ব্রাইট লাগছে।"

"যাক, নজরে পড়েছে তা হলে। ...খুব যে বলিস মেয়েদের দিকে নাকি তাকাসই না..."

"তা বলে অন্ধ তো নই।"

"বটে?" অহনা হাসতে হাসতে গলা চড়াল, "কৃষ্ণা, চটপট চা দিয়ে যা। আমরা বেরোব।"

কৃষ্ণার উত্তর শোনা গেল, "জল বসিয়ে দিয়েছি দিদি।"

"রুটিটাও সেঁকে ফ্যাল। আমি তালা দিয়ে যাব।"

অহনার এই সপ্রতিভ উচ্ছল রূপ অবাক করছিল অর্ঘ্যকে। আজ তো সকালেও এমনটা ছিল না। হাসিমুখেই কথা বলছিল, তবে এখনকার উচ্ছ্বাস যেন একটু বাড়তি। অর্ঘ্য সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে বলে এত খুশি? এখন কি আজই চলে যাওয়ার কথা উচ্চারণ করা যায়? উঁহু, মন থেকে সায় পাচ্ছে না। বরং একটা অন্য রকম বিকেলের সম্ভাবনাই তাকে টানছে যেন।

অহনা হালকা ধমক দিল অর্ঘ্যকে, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? তৈরি হয়ে নে।"

অর্ঘ্য কাঁধ ঝাঁকাল, "আমি তো রেডি।"

"ওই বারমুডা পরে যাবি? আমার সঙ্গে? চটি ফটর ফটর করতে করতে? আশাবরীর ম্যাডামের একটা ওজন নেই?" অহনা ঠোঁট টিপে হাসল, "যা, একটু ভদ্রগোছের পোশাক পরে আয়।"

অগত্যা অর্ঘ্য ঘরে এল। পলক ভাবল, কী পরে এখন। ঘিয়েরঙা কর্ডের প্যান্টটা বার করবে? সঙ্গে যা হোক একটা টি-শার্টই যথেষ্ট। ঝুঁকে ঝোলাব্যাগটা খাটের তলা থেকে টানতে গিয়ে দেখল, অনেকটা ভেতরে ঢুকে আছে। নির্ঘাত কৃষ্ণার কাজ। ঝাঁট দিতে গিয়ে কখনও টেনে বাইরে নিয়ে আসে তো কখনও ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়।

শার্ট-প্যান্ট চড়িয়ে পায়ে স্নিকার গলাচ্ছিল অর্ঘ্য। ফিতে বাঁধতে বাঁধতে পলকা চিন্তার ঝিলিক। মুডটা ভাল আছে অণুদির, আজই চাইবে টাকাটা। মোটামুটি কত বলবে? তার আগে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ছকে নেওয়া দরকার। কলকাতা নয়, অন্য কোনও বড় শহরে যাবে এখন। অন্তত মাস চারেক কোনও সাড়াশব্দ করবে না। লুকোনোর জন্যে বেঙ্গালুরু সবচেয়ে নিরাপদ শহর। স্কুলের সহপাঠী তাপস আছে বেঙ্গালুরুতে। আই টি সেক্টরে। গত বছর দিল্লি গিয়েছিল অর্ঘ্য, হঠাৎ সেখানে তাপসের সঙ্গে দেখা। ব্যাটা বিয়ে-থা করেনি, করার নাকি বাসনাও নেই। হোয়াইট কলার জব করে তাপস, পাক্কা প্রতিক্রিয়াশীল। তবে খুব আন্তরিক, প্রায় সেই স্কুল লাইফের মতোই। অর্ঘ্যকে বলেছিল, চলে আয় ক'দিন জমিয়ে কাটানো যাবে। ইন্দিরানগরে থাকে তাপস, ওর কার্ডটাও আছে পার্সে, ওখানেই নয় এক দু'মাস...। এরকম রিসার্চের বাহানায় বেশি দিনও থাকা যায়। তেমন খরচ হয়তো কিছু হবে না, তবু হাজার পনেরো-বিশ তো রাখতেই হয় পকেটে।

কিন্তু কী অজুহাত দেখাবে? সত্যি সত্যি তার মা'র অসুখ... কিন্তু মা তো এখন সিঙ্গাপুরে...! মিথ্যে বলার কী বখেড়া! আরও যে কত মিথ্যেকে আঁকড়ে ধরে তাকে থাকতে হবে এখন!

অহনা ডাকাডাকি করছে, "কী রে হল? চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

অর্ঘ্য তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। টেবিল থেকে কাপ-ডিশ তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুমুক দিচ্ছে চায়ে। বলল, "বড্ড বেশি ছটফট করছ। জুন মাসের বিকেল, সূর্য ডুবতে এখনও ঢের দেরি।"

"একটু আগে আগে যাওয়াই তো ভাল। ঘুরে ঘুরে চরটা দেখা যাবে।"

“যদি দেখার মতো কিছু থাকে। আছে তো কিছু চাষের খেত আর জংলা ঝোপঝাড়।”

“আলো না থাকলে তাই বা দেখবি কী করে? সন্ধের মধ্যে ফিরে আসব, অন্ধকারে ওখানে কিন্তু থাকব না।”

“যো আপকি মর্জি।”

চা শেষ করে কাপ-ডিশ রান্নাঘরে দিয়ে এল অর্ঘ্য। কৃষ্ণা রুটি বানিয়ে রাখছিল ক্যাসারোলে।

পেয়ালা-পিরিচ ধুয়ে এবার তার বেরিয়ে পড়ার পালা।

যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করল, “মাসিমা কবে আসছে গো দিদি?”

“সামনের শনিবার।”

“তুমি আনতে যাবে?”

“ঠিক নেই। দাদাও পৌঁছে দিতে পারে।”

“মাসিমা এলে আমি কিন্তু ক’দিন ছুটি নেব।”

“কেন?”

“বাবার শরীরটা ভাল নেই। হার্টের খুব ব্যামো। মাঝে তো যায় যায় হয়েছিল, কোনও গতিকে সামলেছে। ক’দিন বাপের বাড়ি গিয়ে থেকে আসব ভাবছি। কবে পুট করে মরে যায়...”

অহনা বলল, “আচ্ছা সে দেখা যাবেখন।”

কৃষ্ণার আর্জি শুনতে শুনতে অর্ঘ্য সামান্য উদাস। মা’র কথা মনে পড়ল কি? আর কি দেখা হবে মা’র সঙ্গে?

কৃষ্ণার প্রায় পিছু পিছুই বেরোল অর্ঘ্যরা। হাঁটছে দু’জনে, অলস মেজাজে। ফুরফুরে হাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে, কেমন যেন চাপা গুমোট চরাচরে। প্রকৃতি যে কখন কীভাবে মেজাজ মর্জি বদলায়!

ঘাটের কাছাকাছি এসে দুলালের সঙ্গে দেখা। ছাতা বগলে কোথায় যেন যাচ্ছিল, অর্ঘ্য ধরেছে তাকে,

“কী গো, চললে কোথায়?”

“আজ্ঞে মেয়ে-জামাই এসেছে। তাই একটু বাজারের দিকে...”

“সে কী? তোমার ভরসাতেই যে বেরোলাম।”

দুলাল অবাক মুখে বলল, “কেন কর্তা?”

“আমি আর তোমাদের আশাবরী ম্যাডাম একটু চরে বেড়াতে যাব যে।”

“কিন্তু কর্তা আজ যে আমি...। দেখেন না, ঘাটে আরও নৌকো আছে।”

“না না, তোমাকে ছাড়া যাবই না।” দুলালের পিঠে আলগা চাপড় দিল অর্ঘ্য, “এসো এসো। কতক্ষণই বা লাগবে? গিয়ে হয়তো ঘণ্টা খানেক থাকব, ফিরে তার পরে নয় বাজার যেয়ো।”

দুলাল তবু যেন দোলাচলে। ঘাড় চুলকোচ্ছে।

“কী হল, অত ভাবনার কী আছে?” অর্ঘ্য চোখ টিপল, “আমাদের ঘুরিয়ে আনলে তোমার মেয়ে-জামাইয়ের বাজার খরচাটা কিন্তু উঠে যাবে।”

অব্যর্থ দাওয়াই। ধরেছে ওষুধ। দুলাল রাজি।

নৌকোয় উঠতে বেশ কসরত করতে হল অহনাকে। বিপদও ঘটছিল প্রায়। অসমান পাড়, ঘাটে নামতে একবার খামচে ধরছে অর্ঘ্যর হাত, পরক্ষণে দুলালকে। পাটাতনে পা রাখতেই বিশ্রীভাবে দুলে উঠল নৌকো, টলে গেল ব্যালেন্স। দু’ কাঁধ চেপে ধরে কোনও ভাবে অহনাকে স্থিত করল অর্ঘ্য। বসিয়েছে। অহনা হাঁপাচ্ছিল অল্প অল্প। যত না পরিশ্রমে, তার চেয়ে বেশি নার্ভাসনেসে।

বাবু-বিবিদের এমন বেপথু হাল দেখে অভ্যস্ত দুলাল, টেরিয়ে হেসে ছাড়ছে নৌকো। অহনার পাশে বসে অর্ঘ্য বলল, “খুব ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে?”

অহনা ফ্যাকাশে হাসল, “খুব নয়। একটু। জলে পড়লে কী কেলেঙ্কারিটাই না হত।”

“অমন টলমল করছিলে কেন? আগে তো চড়েছ নৌকোয়।”

“সে কবে... কত দিন হয়ে গেল...। তখন শাড়িও পরা ছিল না।”

“হ্যাঁ ম্যাডাম, সালোয়ার কামিজেই সুবিধে।” দুলাল এবার ফুট কাটল। পাড় থেকে নৌকো সরাতে সরাতে বলল, “সব্বাই বলে, ওই ডেরেসেই ম্যাডামকে বেশি এস্মাট দেখায়।”

অর্ঘ্য গলা নামিয়ে বলল, “দেখেছ তো, তোমাকে কোন পোশাকে কেমন লাগে তাই নিয়েও লোকেরা...”

অহনা ভ্রূকুটি হানল, বুঝি মন্তব্যটা তার পছন্দ হয়নি। চুপ করে গেল অর্ঘ্য। তাকিয়ে আছে পাড়ের দিকে। আগের দিন ছিল পড়তি বেলা, আজ সূর্যের আলো এখনও মরেনি খুব একটা। তীরভূমির রূপও তাই আজ অন্য রকম। মায়াবী মায়াবী নয়, বড্ড বেশি বাস্তব।

শুধু এই অহনার পাশে বসে থাকাটাই যা অলীক। একটু আগে সে অহনার কাঁধদুটো ধরেছিল, এখনও যেন স্পর্শটা লেগে আছে হাতে। এত কোমল হয় রমণীদেহ? যে বাতাস অহনাকে ছুঁয়ে তার গায়ে এসে লাগছে, তারও রূপ রস গন্ধ যেন আলাদা রকম। মেয়েদের স্পর্শ পেয়ে বাতাসও কি আপনা আপনি বদলে যায়?

দুলালের গলা শোনা গেল, “জলের বেশ টান আছে কর্তা। জোয়ার চলছে তো, তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবেন।”

অর্ঘ্যর আগে অহনাই বলল, “ভালই তো। একটু বেশিক্ষণ থাকা যাবে।”

“আমি একটা কথা বলব ম্যাডাম? যদি অনুমতি দেন?”

“কী?”

“যদি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আমি একবার বাড়ি ঘুরে আসি? মানে বাজারটা যদি...?” দুলাল কাঁচুমাচু মুখে বলল, “আমার হয়েছে বিপদ। ছেলেটা কোন ভুবনে চরে বেড়াচ্ছে কে জানে, এদিকে জামাই

মানুষটা ঘরে এল... ষষ্ঠীতে সে এবার থাকবে না... আজ তাকে বিশেষ আপ্যায়ন না করলে চলে? রাতদুপুরে বাজার নিয়ে গেলে মেয়ের মা কখন রাঁধবে, কখন খেতে দেবে...”

“হয়েছে হয়েছে। আর সাতকাহন শোনাতে হবে না।” হাত তুলে অহনা থামাল, তা আমাদের কী হবে? আমরা পড়ে থাকব?

“না ম্যাডাম। আপনারা একটু ঘুরুন, সন্ধে নামতে না নামতে আমি এসে যাব।”

“দেখো, ঝুলিয়ো না যেন। অন্ধকার হলে আমাদের তখন আর কিচ্ছু করার নেই। তার ওপর সাপখোপ...”

“মোটে ভাববেন না। আমি ঠিক চলে আসব।”

দুলাল ভারী আহ্লাদিত হয়েছে। দাঁড় টানছে জোরে জোরে। এগিয়ে আসছে সবুজ।

জল আর নারীর গন্ধ নিতে নিতে ঊর্ধ্বপানে তাকিয়েছিল অর্ঘ্য। ফস করে জিজ্ঞেস করল, “আকাশের গতিক কেমন বুঝছ দুলাল?”

ভুরু কুঁচকে দুলাল ঈশানকোণটা দেখল। বিজ্ঞের মতো রায় দিল, “বৃষ্টি এক-দু’ পশলা হবে।”

“মুষলধারে নামবে না তো?”

“মনে হয় না। এ বছর কবেই বা তেমন ঝমরঝমর নামল! তবে একটু ঝড়ও উঠতে পারে।”

“তুমি তার আগে আসছ তো?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ। জল নামতে এখনও ঢের দেরি।”

অর্ঘ্য তবু পুরোপুরি স্বস্তি পেল না। আবার যেন টিপটিপ দুশ্চিন্তাটা ফিরে আসছে। হৃদয়ের কোনও এক গোপন কোণে জমছে মেঘ। শুধু মেঘের উত্সটা বুঝতে পারছিল না অর্ঘ্য।

মা’র অসুখ? বাবার মোবাইলে সেই ফোন? তেজস? পুলিশ? নাকি অন্য কিছু?

১০. দূর থেকে সুন্দর দেখায়

॥ ১০ ॥

দূর থেকে যেমন শ্যামল সুন্দর দেখায়, চরটা আদতে তেমন নয়। যেটুকু সবুজের সমারোহ তা শুধু নদীর পাড় ধরেই। চরের মধ্যিখানে গাছপালা আছে, তবে তো মোটেই ঘন নয়। ছাড়া ছাড়া। ছ্যাকরা ছ্যাকরা। গাছ বলতে তাল আর নারকেলই বেশি, কিছু বাবলা শিমূল জারুল অপরিকল্পিতভাবে রোপণ করা হয়েছিল কখনও, তারাও বেড়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বাঁশঝাড়ও চোখে পড়ে দু'-চারটে। খেত প্রায় সবটাই ধানজমি, এখন সেখানে এবড়ো খেবড়ো মাঠ। অল্প স্বল্প জায়গা নিয়ে ঝিঙে ঢ্যাড়শ বোনা হয়েছে কোথাও কোথাও। তৈরি ফসল তুলে তুলে বস্তাবন্দি করছে চাষিরা, হয়তো আজই সন্ধেয় পৌঁছে যাবে টিয়াডাঙায়। হরেনবাবুর আড়তে।

এমন কিছু নয়নাভিরাম দৃশ্য নয়। তার বহতা জীবনটার মতোই জোলো, অনাকর্ষণীয়। অহনা হতাশ বোধ করছিল। আগে যখন এসেছিল, সেবারও চোখ টানেনি, ভেবেছিল এবার হয়তো...। তা তার কপালই তো এরকম, কোনও কিছুই কি ভালর দিকে এগোয়? বহুকাল পর একটু বা অন্য রকম বিকেল আজ আশা করেছিল, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ানোর রংটাও যেন ফিকে হয়ে আসছে দ্রুত।

ঘুরে ঘুরে যে চরখানা দেখবে তার হ্যাঙ্গামা কম? রাস্তা বলতে তো প্রায় কিছুই নেই, মাঝে মাঝেই আলপথ ধরতে হয়...। আধা ঘণ্টা হেঁটেই অহনার দম নিঃশেষ। রোদ নেই, তবু ঘামছে দরদর।

অর্ঘ্যরও যেন ভ্রমণে মন নেই। এলোমেলো ঘুরছে এদিক ওদিক, চাষিদের সঙ্গে খানিক গল্প জুড়ল, সবজিখেতে নেমে স্বহস্তে পরীক্ষা করছে ফসল, নিরীক্ষণ করতে গেল লাঙলটানা বলদের গোয়াল, কিন্তু সবেতেই যেন একটা নিয়মরক্ষের ভাব।

অহনা বসে পড়েছিল, ঘাসে, তালগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে। অর্ঘ্যর বুঝি হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, অহনা পাশে নেই। খুঁজতে খুঁজতে অর্ঘ্য এল সেখানে। একটু যেন অবাক। বলল, “হল কী? আর যাবে না?”

অহনা শ্রান্ত গলায় বলল, “কোথায় আর ঘুরব? গোটা চরটাই তো এক রকম। ভেবেছিলাম, হয়তো কিছু বদলেছে...”

“কিছুই কি সেভাবে বদলায় দুনিয়ায়? বদলাই শুধু আমরা। আমাদের চারপাশটা কিন্তু একই থেকে যায়।”

অহনা কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না। চারপাশ বলতে অর্ঘ্য কী বোঝাচ্ছে? চতুর্দিকের বাড়িঘর গাছপালা...? নাকি মানুষজন সমাজ নিয়ে গড়ে ওঠে আস্ত দুনিয়াটা। না, অর্ঘ্য মাঝে মাঝেই এমন কথা বলে, অহনা ঠিক ধরতে পারে না। সেদিন সুশোভন স্যারের মর্মান্তিক কাহিনি শুনে উদাস মুখে বলল, “দুঃখেই যার আনন্দ, তার দুঃখ কে খণ্ডায়!” দুঃখে কেউ আনন্দ পায় নাকি? কালই তো বলছিল, সুগত নাকি যতটা শয়তান, তার চেয়েও বেশি দুর্ভাগা! কেন এমন মনে হল অর্ঘ্যর কে জানে। তবে ও যে দুনিয়াটাকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করে, এতে অহনার সংশয় নেই।

অর্ঘ্যর কথার অর্থ না খুঁজে অহনা জিজ্ঞেস করল, “তোর ভাল লাগছে এই চরটা?”

“ভালমন্দ মিশিয়েই তো মানুষের ভাল লাগা। ভাল না লাগাটা এক ধরনের অসুখ। আমাকে এখনও ওই রোগে ধরেনি।”

“ও। তার মানে তুই মোটামুটি এনজয় করছিস?”

“জানি না। উপভোগ করছি, কি করছি না তাই নিয়ে সেভাবে ভাবিনি তো।” অর্ঘ্য যেন সামান্য অন্যমনস্ক। তালগাছের মাথাটা দেখতে দেখতে বলল, “আর উপভোগ না করলে যে খারাপ লাগতেই হবে, তারও তো কোনও মানে নেই। অনেকে তো খারাপ লাগাটাকেই উপভোগ করে।”

“কী যে ছাইপাঁশ বকিস!”

“আমাকে বকালে তো এই সবই শুনবে। ...এখন ওঠো ওঠো, চলো...”

“কোথায়?”

“চর হলেও এটা তো আদতে একটা দ্বীপ। ওপ্রান্তে যাবে না একবার?”

“সে কদ্দূর?”

“চাষিরা তো বলছিল কাছেই। পাঁচ-সাত মিনিটের হাঁটাপথ।”

“কী আছে সেখানে?”

“তুমি না বলছিলে চরে কী আছে গিয়েই দেখবি? এখন উলটো গাইছ?”

মোক্ষম কথার প্যাঁচ। অগত্যা অহনাকে উঠতেই হয়। অর্ঘ্যর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে খাড়াপশ্চিমে। তিন চারজন চাষি ফিরছে জমি থেকে, মাথায় বস্তা চাপিয়ে। তাদের একজন অহনাদের দেখে দাঁড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, “কোথা যাচ্ছেন গো আপনারা?”

অর্ঘ্য উত্তর দিল, “এই তো, চরের ওপাশটায়।”

“বেশি দেরি করবেন না। বড় ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে।”

উত্তর-পশ্চিম কোণে চোখ পড়তেই অহনা ঈষৎ সন্ত্রস্ত, “ব্যাক করে গেলে হয় না?”

“অ্যাদ্দুর এলাম...আর তো এইটুকু...”

চাষিটা বলে উঠল, “তাড়াতাড়ি ঘুরে আসেন। আলাইপুরের ঘাটে যাবেন তো? তা হলে আমাদের নৌকোতেই...”

“চিন্তা নেই গো। আমাদের ফেরার নৌকো আছে।”

লোকটা আর দাঁড়াল না। পা চালিয়েছে। দুলে দুলে চলেছে পূবে। অহনারাও গতি বাড়াল। ছোট্ট একটা কলাবন পেরিয়ে পৌঁছেছে চরের কিনারে।

ওপার মোটেই তেমন দূর নয়। বরং আলাইপুরের থেকে যেন কাছেই। নদীও এদিকে যেন অনেকটা মরা মরা। ওপারের বাড়িঘর গাছপালা দেখা যায় স্পষ্ট। একটা মন্দিরও দৃশ্যমান, আলাইপুরের মতো।

অহনা নিরাশ গলায় বলল, "মিছিমিছি এলাম। এদিকেও তো ওপারটা একই রকম।"

"উঁহু। ভাল করে দেখো।" অর্ঘ্য আঙুল তুলল, "লক্ষ করো, ওই একটা জমিদারবাড়ি। এখন প্রায় ভগ্নস্তূপ। তা ছাড়া ঘরবাড়িও মোটেই আলাইপুরের মতো নয়। বোঝা যায়, বেশ পুরনো বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। ওদিকটায় তো হুগলি জেলা, তাই না?"

"তাই তো শুনেছি। তবে চরের পুবপাড় আর পশ্চিমপাড়ে আমি তো কোনও তফাত দেখছি না।"

"তফাত আছে কি নেই, সেটা কোনও বড় ব্যাপার নয় অণুদি। আসল ব্যাপার হল, যে দেখছে তার মনটা।"

"মানে?"

"প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। জীবনে একটা সময় সামান্য পার্থক্যও খুব প্রকট লাগে। আবার এমনও সময় আসে, যখন ডিফারেন্সগুলো খোঁজার দৃষ্টিটাই চলে যায়। তখন ভাল মন্দ সুন্দর কুত্সিত সব কিছুই মনে হয় এক রকম। জীবনের রংগুলোও তখন আলাদা করা যায় না। এভরিথিং বিকামস গ্রে। ধূসর।"

অর্ঘ্যর কথাটা মোটেই দুর্বোধ্য ঠেকল না তো? তার দিকেই আঙুল তুলছে যেন। সুগতয় মোড়া অতীতের দিকে ইঙ্গিত করে বোঝাতে চায়, এখন অহনার নজরটাই ভোঁতা হয়ে গেছে! কতটুকু জানে, কী কষ্টটাই যে সয়েছে অহনা? যতটা না শরীরে, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি মনে। মেয়েরা কত আশা নিয়ে ঘর বাঁধে, অর্ঘ্যর কোনও আন্দাজ আছে? স্বপ্নভঙ্গের অভিঘাত অন্তরাত্মাকে যে কীভাবে চুরচুর করে দেয়, অর্ঘ্য তা অনুভবই করতে পারবে না। তাও তো অহনা আজ নিজেকে প্রাণপণে উজ্জীবিত করতে চেয়েছে। কাল সুগত এসে দিনটাকে বিষিয়ে দিয়ে গেছিল, তার পরেও। এখন যে আর সেই

বানানো খুশি খুশি মেজাজটা বজায় রাখতে পারছে না, তার জন্য জ্ঞান দেওয়ার ছলে কটাক্ষ হানা কি সাজে অর্ঘ্যর?

অহনা সামান্য ব্যথিত স্বরে বলল "কী করি বল, আমি মানুষটাই যে এরকম। রসকষহীন, চোখে ন্যাবা, একটা জঘন্য বিরক্তিকর প্রাণী, যার কাছাকাছি থাকলেও অন্যদের জীবন বিষময় হয়ে ওঠে।"

অর্ঘ্য চোখ পিটপিট করল, "যাহ বাবা, আমার কথার তুমি এই অর্থ করলে? আসলে আমি বলতে চাইছিলাম..."

বাক্যটা শেষ হওয়ার আগেই আচমকা এক দমকা হাওয়া। এমনই এক ঝাপটা দিল, অহনার আঁচল ঠিকরে গেল গা থেকে। বেপথু অহনা কোনওমতে সামলাতে চাইল আবরু। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ নেমে এল ধরায়, আরেকটা উলটোমুখো খ্যাপা বাতাস ছিটকে দিল অহনাকে।

পড়েই যাচ্ছিল অহনা, অর্ঘ্য তাকে ধরে ফেলেছে। বলল, "আর এক মুহূর্ত দেরি নয়, দৌড়োও।"

বলার প্রয়োজন ছিল না, ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের তাড়নায় ছুটতে শুরু করেছে অহনা। এক লহমায় ঝুপ করে কমে গেছে দিনের আলো, মেঘের আবরণে নেমে এল আঁধার। দিক ঠিক করতে পারছে না অহনা, দিশাহীন পা এঁকেবেঁকে অর্ঘ্যকে অনুসরণের চেষ্টা চালাচ্ছিল। অর্ঘ্য দাঁড়িয়ে পড়ল, চেপে ধরল অহনার করতালু। আবার ছুটছে দু'জনে। গাছেরা সব ঝাঁকুনি খেয়ে উন্মাদের মতো দোলাচ্ছে মাথা, মড়মড় আওয়াজ তুলে ভেঙে পড়ছে ডাল, ছিন্ন শাখা উড়ছে হাওয়ায়, ভয়ংকর বেগে আছড়ে পড়ল মাটিতে। হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দের সঙ্গে মিলে বিকট রব উঠছে মুহুর্মুহু।

অহনা কাতরভাবে চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা বোধহয় আর ফিরতে পারব না।"

অর্ঘ্য ধমক দিল, "আহ, কোনও কথা নয়। আমি তো আছি।"

"এই ঝড়ের মধ্যে আমাদের ঘাট অবধি পৌঁছোতে পারব?"

"না পারার কী আছে? এখনও দিব্যি চারদিক দেখা যাচ্ছে।"

অর্ঘ্য বলল বটে, কিন্তু কিছুই প্রায় দেখতে পাচ্ছে না অহনা। শুধু যে আলোই কমে এসেছে তা নয়, বালি ভরতি শুকনো ধুলোর মত্ত দাপাদাপিতে চোখ খুলে তাকানোই দুঃসাধ্য।

অহনা বলে উঠল, "আমরা কিন্তু তোর সেই মাঝির জন্য ওয়েট করব না। সবজির নৌকাতেই চড়ে পালাব।"

"সে হবেখন। আগে নদীর ঘাট অবধি তো পৌঁছোই।"

মাত্র দশ-বারো মিনিটের দূরত্ব, ঝড়ের তাণ্ডবের সঙ্গে লড়ে ওটুকু পথ পেরোতেই যেন অনন্ত কাল কেটে যাচ্ছে। অবশেষে দেখা দিল নদী। কিন্তু ঘাট তো শুনসান। ক্ষীণ আলোতেও বেশ বোঝা যায় চাষি-ব্যাপারীদের তরী বিদায় নিয়েছে চর থেকে।

অহনা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, "কী হবে এখন?"

অর্ঘ্য বলল, "ঘাবড়াচ্ছ কেন? ঝড়টা কমতে দাও। দুলাল এসে যাবে।"

"যদি না আসে?"

"আরে, আমরা কি জলে পড়ে আছি নাকি? তুফানে ভেসে যাব এমন সম্ভাবনা নেই। এক বেলা খাওয়া না জুটলে খিদেতে মরেও যাব না। তা হলে আর ভয়টা কীসের?"

"তা বলে সারাটা রাত এই জনমানবহীন একটা দ্বীপে...।"

"আগেই অতটা ভেবে নিচ্ছ কেন? একটু ধৈর্য ধরো..."

আঁধার নামছে ভেবেই অহনার বুক ঢিপঢিপ করছিল। সত্যি সত্যি অন্ধকার হয়ে গেলে যে কী হবে অহনার? দুলাল না কী একটা যেন নাম বলল অর্ঘ্য, সে কি ঝুলিয়ে দেবে? অহনাদের রেখে গেল, ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেই তার?

কানে তালা লাগিয়ে বাজ পড়ল একটা। পরক্ষণে আবার একটা। হাওয়ার বেগ কমেছে সামান্য, কিন্তু মেঘের গুড়গুড় ধ্বনি যেন চড়ছে ক্রমশ। পড়পড় শব্দে বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা পড়ল গায়ে। চমকে

উঠেছে অহনা। উত্তাল ঝড়ের মধ্যে এই সম্ভাবনাটা যেন মাথায় ছিল না এতক্ষণ, জলবিন্দুর স্পর্শমাত্র মগজের স্নায়ু টানটান। কিছু ভাবার আগেই দাপট বেড়ে গেল বৃষ্টির। নূপুরের ছন্দে নয়, বুনো মোষের মেজাজে নেমেছে মুষলধারায়। তেমন ঘন ডালপালাওলা গাছও নেই যে তার নীচে আশ্রয় নেবে। দ্যাখ না দ্যাখ, ভিজে জাব হয়ে গেল অহনা।

অর্ঘ্যই বলে উঠল, "এ তো মহা বিপদ হল। এরকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোকার মতো ভিজব নাকি?"

অহনা করুণ স্বরে বলল, "কী হেল্পলেস সিচুয়েশন। আমাদের কিচ্ছু করার নেই?"

"তাই তো দেখছি। বাড়িটাড়িও তো নেই যে গিয়ে উৎপাত করব।"

"তখন গোয়ালটায় ঢুকেছিলি না? ওর মাথায় ছাউনি নেই?"

"ঠিক বলেছ তো।... হ্যাঁ, আছে বোধহয়... কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে... অন্ধকারে..."

"মোবাইলটাকে টর্চ হিসেবে ইউজ় করলে..."

"কারেক্ট।...তবে দেখতে হবে যেন জল না লাগে।"

"ভাল করে মুঠোয় চেপে রাখ। আমি আমার মোবাইলটাও জ্বালাচ্ছি।"

একই দাপটে ঝরছে বারিধারা। দু'কুচি ক্ষীণ আলোয় পথ দেখে সন্তর্পণে এগোচ্ছে দু'জনে। বারবার অহনাকে সতর্ক করছে অর্ঘ্য, যেন সে আছাড় খেয়ে বাড়তি বিপদ না বাধায়।

গোয়ালে পৌঁছে একটু যেন স্বস্তি বোধ করল অহনা। তিনটে বলদ রয়েছে গোয়ালে, আঁধারে চকচক করছে ছ'-ছ'খানা চোখ, উত্কট একটা গন্ধ বেরোচ্ছে ঘরটায়, তবু যেন অসহায় বিপন্নতার শঙ্কা কমল খানিকটা। বাইরে থেকে আসা অবিরল বৃষ্টির ধ্বনি যেন এই মুহূর্তে বিপদের সংজ্ঞাটাই পালটে দিয়েছে। আশ্রয়হীনতা থেকে যা হোক কিছু একটা জোটার তফাতটা বুঝি টের পাচ্ছে মর্মে মর্মে।

বাবার রেখে যাওয়া বাড়িটার কথা কি অহনার মনে পড়ল একবার? এই মুহূর্তে? হয়তো না। বর্তমানের বিপন্নতা বুঝি মানুষকে, ক্ষণিকের জন্য হলেও, স্মৃতিহীন করে দেয়।

অহনাও তাই এখন কিছুই ভাবছে না, শুধু চরম অস্বচ্ছন্দ এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার চিন্তায় ব্যাকুল। একটা বলদ হঠাৎ গলা ছেড়ে ডেকে উঠল, ওই নিরীহ ধ্বনিতেও বুঝি বেড়ে গেল ধুকপুকুনি। আতঙ্ক গোপন করে অহনা বলল, "এভাবেই থাকব নাকি সারা রাত?"

"বললাম তো, ঝড়বৃষ্টিটা কমতে দাও। দুলাল আসবে।"

অহনা একটুও ভরসা পেল না। বড্ড অন্ধকার, দুঃসহ অন্ধকার। অনেক বছর আগে, যখন তারা আসানসোলে থাকত, একবার শাকতোরিয়া কয়লা খনিতে নিয়ে গেছিল বাবা, নীচে খনির গহ্বরে নামার বন্দোবস্তও করে দিয়েছিল তখন। কপালে আলো বাঁধা যে অফিসারটি তাকে আর দাদাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খনির অন্দরটা দেখাচ্ছিল, খেলাচ্ছলে মিনিট কয়েকের জন্য নিবিয়ে দিয়েছিল আলো। চারপাশে ঘন কালো দেওয়াল সহ গোটা পৃথিবীটাই অমনি পলকে উধাও। নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিল না তখন। আজও এই গোয়ালঘরের অন্ধকার যেন তারই কাছাকাছি। অর্ঘ্য প্রায় তাকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে, তার নিশ্বাসটা পর্যন্ত অহনা টের পাচ্ছে, অথচ সেই মানুষটা তার অগোচর, এ যে কী গা শিরশিরে অনুভূতি!

সময় কাটছিল নিজের মনে। অথবা কাটছিল না। বৃষ্টি কিন্তু ক্লান্তিহীন, একই লয়ে আক্রমণ করে চলেছে ধরিত্রীকে।

হঠাৎ খানিক দূর থেকে অর্ঘ্যর গলা, "এদিকটায় এসো।"

অর্ঘ্যর স্বরে চাপা চঞ্চলতা। না নড়েই অহনা বলল, "কেন?"

"গোয়ালের পেছন দিকে একটু যেন ঢাকা স্পেস মতন আছে। মনে হচ্ছে, ওখানে বৃষ্টি লাগবে না।"

"ওমা তাই?"

এক পা এক পা করে বেরিয়ে এল অহনা। মোবাইলের সরু তীক্ষ্ন আলোয় আবছা আবছা দেখতে পেল জায়গাটা। সত্যিই তো খড়ের চালা রয়েছে এদিকটায়। ঘর নয়, তিন দিকে দেওয়ালও নেই, কিন্তু মাথায় খড়ের ছাউনি। কী কাণ্ড, গোটা পাঁচেক দড়ির খাটিয়াও অবিন্যস্তভাবে পড়ে!

কোনও কিছু না ভেবেই একটা খাটিয়ায় বসে পড়ল অহনা। আহ, ক্লান্ত পা দু'খানা যে কতক্ষণ পর বিশ্রাম পেল!

অর্ঘ্য বলল, "কী ব্যাপার বলো তো? খাটিয়া আছে, মানুষ নেই..."

"বোধহয় গোরুর মালিকের অস্থায়ী শেলটার। হয়তো কখনও সখনও রাতে থেকে যেতে হয়...।"

"হতে পারে। চাষবাসের সময় হয়তো দুপুরেও এখানে জিরোয়। ফসল পাহারার জন্যে মাঝেসাঝে নাইট স্টে-ও করতে হয় নিশ্চয়ই। ওইসব ভেবেই হয়তো একটা অস্থায়ী ঠেক বানিয়ে রেখেছে। আজ আমাদের কাজে লেগে গেল।"

"ওরা এক-আধজন আজ রয়ে যেতে পারত।" বাইরে বৃষ্টির ঝাঁঝ বাড়ল হঠাৎ। পাল্লা দিয়ে অহনার গলাও চড়ে গেল সহসা, "বদমাইশের দল। আমাদের ফেলে রেখে নৌকো নিয়ে ভেগে পড়ল? আরেকটু অপেক্ষা করতে পারত না?"

"খামোখা ওদের দুষছ কেন? ভুল তো আমাদের। আরও ঠিকঠাক ভাবে বললে আমার। ওরা তো আমাদের অফার দিয়েছিল। আমিই তো..."

"চুপ কর। বেড়াতে এসে আমাদের ত্রুটি-ভ্রান্তি ঘটতেই পারে। তা বলে ওরা এমন বেয়াক্কেলেপনা করবে?" অহনার গলা আর এক পরদা উঠল, "সব্বাই নেমকহারাম। ওদের ঘরের মেয়ে-বউদের জন্য উদয়াস্ত খেটে মরি, সেইটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ যদি ওদের থাকত..."

"কী আজেবাজে বকছ? এরা হয়তো তোমাকে চেনেই না..."

“বললেই হল? আমাকে চেনে না এমন কেউ আছে এ তল্লাটে?” বলেই যেন হোঁচট খেল অহনা। এমন একটা ধারণা তার মনে বাসা বেঁধেছে, জানা ছিল না বলেই বুঝি নিজেই চমকেছে। মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যেতে রাগ গিয়ে পড়ল সুগতর ওপর। এবং মনে হতেই শরীরে বিশ্রী জ্বালাপোড়া।

মুহূর্ত চুপ থেকে অহনা বলল, “আমি জানতাম একটা খারাপ কিছু ঘটবে আজ। ওই শয়তানটা এল, আমার কাছে ঝাড় খেল, একটা কিছু বিপদ হবে না? উফ, লোকটাকে যদি একটা চরম শিক্ষা দিতে পারতাম...”

কোনও সাড়াশব্দ নেই। অর্ঘ্য কি কথাগুলো নীরবে শুনে যাবে? বিনা মন্তব্যে? আর আঁধারের আবডালে হাসবে মুখ টিপে?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল অহনার। চালার নীচের স্যাঁতসেতে বাতাসে মিশে গেল নিঃশ্বাসটা। অহনা মৃদু স্বরে ডাকল, “অর্ঘ্য?”

“উঁ?”

“আমি প্রলাপ বকছি...খুব মজা লাগছে, না?”

“নাহ। কষ্ট হচ্ছে। তুমিও বড় কষ্ট পাচ্ছ অণুদি।”

“হয়তো এটাই আমার প্রাপ্য। জীবন তো আমাকে আর কিছুই দিল না। বোকার মতো বেঁচে আছি, কেন বাঁচছি তাও জানি না... আমার মতো একটা হেরো পার্টি...”

“মোটেই না। তুমি একজন হানড্রেড পারসেন্ট উইনার। তোমার মতো একজন সেলফমেড ওম্যান... একা হাতে আশাবরীর মতো একটা প্রতিষ্ঠান গড়েছ... আমার তো তোমাকে দেখে হিংসে হয়।”

“সান্ত্বনা দিচ্ছিস?”

“না গো। মনের কথা বলছি। অন্ধকারের দিব্যি। আজকের এই ঝড়বৃষ্টির দিব্যি।”

“তা হলে আমার কিছু ভাল লাগে না কেন?” অহনার গলা কেঁপে গেল, “কেন মনে হয় সব কিছুর পাট চুকিয়ে কোথাও একটা চলে যাই? যেখানে কেউ আমায় চিনবে না, জানবে না, চেনাজানা কেউ আমার খোঁজ পর্যন্ত পাবে না...”

“সেখানে গিয়ে তুমি শান্তি পাবে? শিয়োর?”

অহনা জবাব দিল না। জবাব কি আছে? তাও সে জানে না।

বৃষ্টি কমেছে সামান্য। অর্ঘ্য হাত বাড়িয়ে পরখ করল বাদলধারা। চোখ সয়ে আসার পর অন্ধকার এখন আর তত গাঢ় নয়, দেখা যায় পরস্পরের অবয়ব। অহনার দিকে ফিরে অর্ঘ্য বলল, “তোমার সমস্যাটা কী জানো? কাজ করার তোমার ক্ষমতা আছে, ব্রেন আছে... দক্ষতা তো আছেই। শুধু হৃদয়টাই তোমার নেই।”

“হোয়াট?”

“হ্যাঁ। কাজটা তুমি করছ জেদের বশে। বিশেষ একজনকে দেখানোর জন্যে। প্রমাণ করতে চাও, সে তোমাকে ঠেলে জলে ফেলে দিতে পারেনি। এবং তুমি তার... শুধু তারই বা বলি কেন, দুনিয়ায় তুমি কারও কৃপাপ্রার্থী হওনি। যা করেছ, নিজের কবজির জোরে করেছ। সত্যি বলতে কী, নিজের অ্যাচিভমেন্টের ব্যাপারে তোমার খানিক অহংকারও আছে।”

অহনা একটু সংকুচিত বোধ করল, “না রে, তুই যা ভাবছিস তা নয়।”

“লজ্জা পেয়ো না। যেভাবে তুমি পরিশ্রম করো, গর্ব করা তোমার সাজে বই কী। কিন্তু এও সত্যি, কাজটাকে তুমি মোটেও ভালবাসতে পারনি। যাদের নিয়ে তোমার আশাবরী, তাদের সম্পর্কে তোমার কোনও আগ্রহ নেই। তারা তোমাকে আপনজনই ভাবে, অথচ তুমি কিন্তু তাদের কাছে ঘেঁসো না। তাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না কোনও কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়াওনি। আশাবরী তোমার কাছে স্রেফ

একটা রুটিন জব। প্লাস একটা চ্যালেঞ্জ। পরীক্ষায় তুমি উতরে গেছ, আর কোনও লক্ষ নেই, প্যাশন নেই আবেগ নেই, কাজে তুমি আর উত্সাহ পাবে কী করে!”

“হয়তো তুইই ঠিক।” অহনা বিড়বিড় করল, “তাই তো ভাবছি, আশাবরীর খেলা এবার শেষ করে দেব।”

“তাতেও শান্তি মিলবে কি? বরং... ভেতরের রাগটাকে ঝেড়ে ফ্যালো অণুদি। সুগতবাবুকে ক্ষমা করে দাও।”

“ওকে মাপ করব? আমি?” অহনা প্রায় ফুঁসে উঠল, “কেন? কোন সুকার্যটা সে করেছে শুনি? ইনিয়ে বিনিয়ে আমায় জপাচ্ছিল বলে?”

“না। তোমার নিজের জন্যে।”

“তুই কী রে? আমাকে সুগতর কাছে ফিরে যেতে বলছিস?”

“উঁহু। তা কি আর হয়? তুমি তোমার জায়গাতেই থাকো, সে বাঁচুক তার মতো করে। শুধু তার দোষত্রুটি অনাচার অবিচার সব মন থেকে ক্ষমা করে দাও। দেখবে, তোমার ভেতরটা কত হালকা হয়ে গেছে।”

“তুই হলে পারতিস?”

অর্ঘ্য উত্তর দিল না। ধীর পায়ে এসে বসল অন্য একটা খাটিয়ায়। বসেই আছে। অহনাও নিশ্চুপ। অর্ঘ্যর কথাগুলোই ভাবছিল। নাকি ভাবনার দোলাচলে ভুগছিল? কখন যে বৃষ্টি পুরো ধরে গেছে, তাও ঠিক খেয়াল করেনি।

অর্ঘ্যর স্বরে সংবিৎ ফিরল, “ওঠো, এবার পাড়ে গিয়ে দাঁড়াই।”

টানা বসে থেকে কোমর ধরে গেছিল অহনার। খাটিয়া ছেড়ে সোজা হতে সময় নিল একটু। চালার বাইরে এসে বলল, “প্রায় দশটা বাজে। দুলাল কি আর আসবে বলে মনে হয়?”

“চান্স কম। তবু...গিয়ে দেখি...”

“চল তবে।”

মেঘ সরে গেছে। চাঁদ নেই, এখনও ওঠার সময় হয়নি বোধহয়। দু’-চারটে তারা ফুটেছে আকাশে। ফিকে অন্ধকারে নদীতীরে যাচ্ছিল অহনা। অর্ঘ্য পাশে পাশে। কখনও হাঁটার ছন্দে অর্ঘ্যর বাহু ছুঁয়ে যাচ্ছে অহনাকে, কখনও বা অসমান পথে টাল সামলাতে অহনাই ধরে নিচ্ছে অর্ঘ্যর কবজি। ভিজে ঠান্ডা হয়ে আছে অর্ঘ্যর গা, তবু যেন একটা স্পর্শতাপ সঞ্চালিত হচ্ছে। অহনা টের পাচ্ছিল।

অনেকটা জল ঝরিয়ে বিকেলের গুমোট ভাব নেই আর। দিনের বেলার তাপও কোথায় উধাও। তবে বাতাস বেশ জোরেই বইছে। দিশাহীন ভাবে। ঝাপটা দিচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ।

পাড়টায় এসে থামল অর্ঘ্য। একটু তফাতে অহনা। সামনে শুনশান নদী। ওপারে ছড়িয়ে থাকা আলোর কুচি, ভারী নরম এক আভা ছড়িয়েছে জলে। জোয়ার চলছে, কিনারায় এসে ভাঙছে ছোট ছোট ঢেউ। ওই কোমল বিচ্ছুরণ, তীর ছোঁয়া কল্লোলের ঝংকার আবিষ্ট করে ফেলছে যেন। অহনার অজ্ঞাতেই এক অন্য অহনা দখল নিচ্ছিল অহনার।

দু’হাত কোমরে রেখে অর্ঘ্য নদীকে দেখছিল। মিনিট পাঁচেক স্থির তাকিয়ে থেকে বলল, “কিছু নজরে পড়ছে?”

অহনার চোখে স্বপ্ন স্বপ্ন ঘোর। আধফোটা স্বরে বললল, “কী?”

“কোনও নৌকা? ডিঙি ফিঙি? এদিকে আসছে?”

“আসছে কি?”

অহনার গলার আওয়াজটা কি ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল? নাকি পালটা প্রশ্নে অবাক হয়েছে অর্ঘ্য? অহনার চোখ থেকে কেন সরাচ্ছে না স্থির দৃষ্টি?

অর্ঘ্যর প্রশ্ন ধেয়ে এল, “এ কী, তুমি কাঁপছ?”

অহনার স্বর জড়িয়ে গেল, “বড্ড হাওয়া... শীত করছে...”

ফস করে অহনার কাঁধে হাত রাখল অর্ঘ্য। ঠিকরে এল উদ্বেগ, “তোমার শাড়ি-ব্লাউজ় তো সপসপ করছে।”

“হ্যাঁ...খুব ভিজে গেছে।”

“এ পরে থাকলে তুমি তো...।”

আর এগোতে পারল না অর্ঘ্য। হঠাৎই যেন বাকরোধ হয়েছে।

আচমকা অহনা ছুঁল অর্ঘ্যকে, ফিসফিস করে বলল, “তোর টি-শার্টও তো ন্যাতা হয়ে গেছে। ঠান্ডা লাগছে না তোর?”

নারীর মাদক স্বরে অপার্থিব আহ্বান। নাকি চরম পার্থিব? একজোড়া পুরুষালি হাত কখন যে বেড় দিয়ে ঘিরে ফেলল অহনাকে তা কি অর্ঘ্যও জানে! নারীর তৃষ্ণার্ত অধর অর্ঘ্যর বুকে ওম খুঁজছে, অহনার সাধ্য কি তাকে রোধ করে!

নদীতীর থেকে ফিরছিল অহনা। এক পা এক পা করে। অর্ঘ্যর হাত বুকের মাঝে আঁকড়ে। কী আশ্চর্য, কামক্ষুধা জাগছে না, বরং এক মধুর তৃপ্তিতে জুড়িয়ে যাচ্ছে অন্তরের দাবদাহ! দেহের কোনও অচিন কুঠুরিতে যে চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রবেশ করছে প্রশান্তির নীর! প্রেমের গোলাপি দিনগুলোয় সুগতর সঙ্গে অনেক তো শরীরী খেলায় মেতেছিল অহনা, এই অনুভূতির আস্বাদ তো পায়নি কখনও। এরই কি নাম হৃদয়ে হৃদয় যোগ করা?

চালায় ফিরে এক খাটিয়ায় বসেছে পাশাপাশি। অর্ঘ্যর কাঁধে মাথা রেখে। অর্ঘ্যর গাঢ় স্বর কানে এল, “আমাদের সম্পর্কের পরিণতি কি জানো অণুদি?”

“উঁহু।” অহনা ঠোঁট ঘষছে অর্ঘ্যর ঘাড়ে, গলায়। আদুরে স্বরে বলল, “জানতে চাইও না রে।”

“কিন্তু আমাকে যে বলতেই হবে।... আমি আলাইপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কালই।”

“হঠাৎ? এত তাড়াতাড়ি?” অহনা সোজা হল, “তোর সমীক্ষার কাজ শেষ?”

“আমার সব কাজই সমাপ্ত হয়েছে অণুদি।... আর বোধহয় আসাই হবে না আলাইপুরে। বোধহয় কেন, আসা হবেই না। আমি নিশ্চিত।”

“কেন?...তুই কোথায় যাচ্ছিস?”

“জানি না। হয়তো এখানকার মতোই কোনও অজ্ঞাতবাসে। কিংবা পরপারে।”

“মানে?” অহনার ঠোঁট নড়ল, “কী বলছিস তুই?”

“হয়তো তোমায় মিথ্যে বলেই পালাতাম। কিন্তু এখন তো আর তা সম্ভব নয়।” অর্ঘ্য কেটে কেটে বলল, “আমি বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী। আমরা চাই সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। পথ একটাই। সশস্ত্র শ্রেণিসংগ্রাম। এখানে ক’টা দিন লুকিয়ে ছিলাম। এবার তো যেতেই হবে।”

“তু...তু...তুই টেররিস্ট?”

“রাষ্ট্র সেরকমই একটা নাম দিয়েছে বটে।... আমাকে কি তোমার অত ভয়ংকর কিছু মনে হয়? আতঙ্কবাদী গোছের?”

“না তো।...তুই কি সত্যিই ভাবিস মানুষ মেরে মানুষের ভাল করা যায়?”

“কয়েক দিন আগেও করতাম। এখন করি না। তোমাকে দেখেই বুঝেছি, রাগ ঘেন্না পুষে রেখে, প্রতিশোধের জন্য ছটফট করে শেষ অবধি কিছুই মেলে না। এখানকার লোকদের সঙ্গে কথা বলেও দেখেছি, অবস্থার বদল হোক ছাই না হোক, হিংসাকেই তারা সবথেকে বেশি অপছন্দ করে। রোজ তারা যতই রক্তপাত দেখুক, খুনোখুনির পথ তারা কখনই মন থেকে মানবে না।”

“তা হলে তো চুকেই গেল। তুই তো তোর ভুল বুঝতেই পেরেছিস। আর কেন পালাবি মিছিমিছি।”

“তো কি এখানে থাকব? খেপেছ? জেনেশুনে তোমায় বিপদে ফেলব?... এমনিতেই তো তোমায় আমি অনেক ঠকিয়েছি। বিস্তর মিছে কথা বলেছি। আমার বাবা মা দিদি কেউ সিঙ্গাপুরে যায়নি, সবাই এখন

আসানসোলে। মা প্রায় মরণাপন্ন, বাবা দিদি তার সেবা করছে। পুলিশ আমায় খুঁজছে বলে সেখানেও আমি আর...” অর্ঘ্যর গলা বুজে এল। জোরে নাক টেনে বলল, “বিপ্লবীর তো কান্না সাজে না, তাই না অণুদি।”

“দূর বোকা। দুঃখে যার কান্না আসে না, অন্যের দুঃখ সে ঘোচাতে পারে?” অর্ঘ্যর পিঠে মৃদু চাপড় দিল অহনা। ধমকের সুরে বলল, “তুই কোথাও যাবি না, আমার ছায়ায় থাকবি। আমি পাখির মতো তোকে আগলে রাখব। ভালবাসার দিব্যি।”

“তুমি জানো না অণুদি, আমার দলের লোকেরা... ওরা আমায়... লোক পাঠিয়ে...”

“আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না। যা বললাম, সেটাই ফাইনাল। নো নড়াচড়া ফ্রম আলাইপুর।... এখন শুয়ে পড়। ভোর ভোর নৌকা ধরে ফিরতে হবে না?”

দড়ির খাটিয়াই শয্যা। অদূরে অর্ঘ্য। ঘুমোচ্ছে? মনে হয় না। অহনাও কি দু’চোখের পাতা এক করতে পারছে? পারা সম্ভব? আজকের এই রাতটায়?

খড়ের ছাউনির ওপরে আকাশের অনন্ত চাঁদোয়া। শলমা-জরি ঝিকমিক করছে চাঁদোয়ার গায়ে। কৃষ্ণপক্ষ পড়েছে সবে, রাঙাভাঙা চাঁদে এখনও জোছনা অপার। বৃষ্টিধোয়া গাছপালা সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। বুনো বুনো। সুখমাখানো। ব্যাং ডাকছিল।

এমন রাত জীবনে মাত্র একবারই আসে। অহনা জানে। বুঝি বা অর্ঘ্যও।

.

॥ ১১ ॥

কাগজের স্তূপ নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল অর্ঘ্য। আশাবরীর রাশি রাশি ভাউচার। প্রতিটি গ্রাহকের কাছ থেকে প্রতিবার টাকা কালেকশনের চার্জ, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার রসিদ, রাহা খরচের বিল, এজেন্টদের কমিশন পেমেন্টের অতি দীর্ঘ তালিকা, আশাবরীর কর্মচারীদের মাইনে, মালপত্র

কেনাবেচার অজস্র ডকুমেন্ট... কী আছে আর কী নেই। প্রতিটি সংখ্যা নিখুঁত ভাবে ভরতে হবে কম্পিউটারের মগজে। সোজা কাজ! চলছে আঙুল, উঠছে ফিগারের পর ফিগার। বেশিক্ষণ টানা চোখ রাখা যায় না মনিটরে, মিনিট চল্লিশেই মাথা প্রায় থান ইট।

কাজটা যে অর্ঘ্য ধীরেসুস্থে করবে, তারও কি জো আছে। যা ডেটলাইনের খাঁড়া ঝুলিয়ে দিয়েছে অণুদি! যত খাটুনিই হোক, কালকের মধ্যে শেষ হওয়া চাইই চাই। রানাঘাটে কে এক জয়ন্তবাবু আছেন, আশাবরী তথা অহনা ম্যাডামের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন জমা করেন ভদ্রলোক। পরশু সূর্য মাঝ গগনে পৌঁছোনোর আগে ওই গন্ধমাদন সাজিয়ে গুছিয়ে জয়ন্তবাবুর হাতে তুলে দিতেই হবে, নইলে নাকি উনি আর আশাবরীর ফাইল স্পর্শই করবেন না। কী জ্বালা! আর এমন একটা ঝামেলার কাজ কিনা অর্ঘ্যর ঘাড়েই চাপল। পাহাড় প্রমাণ কাগজ সমেত তাকে কম্পিউটারে বসিয়ে দিয়ে দিব্যি নাচতে নাচতে কলকাতা চলে গেল আশাবরী ম্যাডাম!

ইলা উঁকি দিচ্ছে দরজায়। কী বোর্ডে আঙুল থামল অর্ঘ্যর। চোখ তুলে বলল, “কী বক্তব্য? বলে ফ্যালো।”

“টিফিনে যাব...দাদা।”

অর্ঘ্য খুশি হল। রোজই খানিকক্ষণ এখানে বসতে হচ্ছে, মেয়েগুলো তাকে স্যার স্যার করছিল, ধমকে ধামকে অভ্যাসটা ছাড়ানো যাচ্ছে তা হলে। প্রসন্ন স্বরে বলল, “তোমরা সকলেই যাবে নিশ্চয়? বেশি দেরি কোরো না।”

“এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব।”

ইলা বেরিয়ে যাচ্ছিল, আচমকা জরুরি কথাটা মনে পড়ে গেল অর্ঘ্যর। পেছন থেকে ডাকল, “এক সেকেন্ড। স্টকের খাতাটা তোমার কাছে রয়েছে না?”

“হ্যাঁ দাদা। লাগবে আপনার?”

“একটু। দিয়ে যাও তো।”

বাঁধানো রুলটানা খাতাটা টেবিলে রেখে চলে গেল ইলা। পাতা উলটে দেখল অর্ঘ্য। বিল চালানের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে এই খাতাটাও পরীক্ষা করতে হবে আজ, এই কাজটাও নাকি খুব জরুরি। কাগজের সমুদ্র ঘেঁটে প্রতিটি এন্ট্রি চেক... অর্ঘ্যর আজ কালঘাম ছুটে যাবে।

সত্যি, অহনা খাটাচ্ছে বটে অর্ঘ্যকে! যেই না সেদিন কাকভোরে একটা জেলে নৌকা ধরে চর থেকে আলাইপুর ফিরল, অমনি জারি হয়ে গেল নির্দেশ। অর্ঘ্যর তো আর সমীক্ষার ছলে গাঁয়ে গাঁয়ে চরে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই, বসে বসে অহনার অন্ন ধ্বংস করাও চলবে না, আশাবরীর জন্য মেহনত দিক অর্ঘ্য।

ব্যস, ডিউটি চালু। গ্রামে গ্রামেই ঘোরো, কিন্তু আশাবরীর কাজে। দ্যাখো, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ানো যায় কি না। অর্ঘ্যর মতো সবল জোয়ান সঙ্গী পেলে অহনার কীসের ভাবনা, স্বচ্ছন্দে সে আশাবরীকে আরও ছড়িয়ে দিতে পারে। সুতরাং দিনভর শুধু চরকি খাও। মেয়ে বউদের জড়ো করো, মিটিং বসাও, বোঝাও আশাবরীর ঋণ দেওয়ার নিয়ম কানুন। শত সহস্র প্রশ্ন থাকে মেয়েদের, গুছিয়ে গাছিয়ে তাদের উত্তর দিয়ে তাদের সংশয় নিরসন কি মুখের কথা। এক এক সময় তো অর্ঘ্যর মনে হয়, এর চেয়ে তাদের বিপ্লব করাটা ঢের সোজা কাজ ছিল। কোথায় কখন কীভাবে শত্রুর ঘাঁটি ধ্বংস করবে, তার প্ল্যান ছকাটাই যথেষ্ট, নিজেদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, কাউকে জবাবদিহি করার কোনও দায় নেই। ভুল হলে নিজেরা মরবে, ঠিক হলে প্রতিপক্ষ খতম, এর কোনও মাঝামাঝি ব্যাপারই নেই। আর এই আশাবরীতে এত ফ্যাকড়া, প্রতিটি গোষ্ঠীর পরিবারে পরিবারে এত আজব আজব সমস্যা, শুনতে শুনতে সাত দিনেই অর্ঘ্যর মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, তার বিপ্লবী হওয়ার চেয়ে মানুষকে নিয়ে মানুষের মাঝে নেমে কাজ করাটা অনেক বেশি কঠিন।

তবে হ্যাঁ, আশাবরীর জন্য খেটে এক ধরনের তৃপ্তিও মিলছে বই কী। মস্তিষ্কের অনেক গাদ যেন সরে যাচ্ছে। শ্রান্ত শরীরটা যখন বিছানায় পড়ে, পলকে নিদ্রা এসে যায়। কী আশ্চর্য, দুঃস্বপ্নও আর দেখছে না!

অহনাও ভারী মজায় আছে যেন। তার সেই দিবারাত্র হাঁড়ি মুখ উধাও, কারণে অকারণে চোটপাট নেই, ইলা-মায়াদের সঙ্গেও হেসে হেসে কথা বলছে। অর্ঘ্যর খেটে খেটে নাকাল হওয়ার গল্পে ব্যথিত তো হয়ই না, উলটে মুচকি মুচকি হাসে। গত শুক্রবার কী খেয়াল হল, মোপেডে চড়ে প্রজাপতির মতো উড়তে উড়তে ব্যাঙ্কে গিয়ে ওভারড্রাফ্টের ঊর্ধ্বসীমা এক লপতে ডবল করে এল! শেফালিকে পরশু নিয়ে এল কলকাতা থেকে, তার সঙ্গেও লড়াই-ঝগড়া বাধছে না! বয়সটাও যেন ঝুপ করে কমে গেছে অনেকটাই।

অর্ঘ্য রয়ে গেছে বলেই কি? নাকি অর্ঘ্যর কথামতো সুগতকে ক্ষমা করে দিয়ে মনটা সমে ফিরেছে? এমনও কি হতে পারে দুটোই মিলেমিশে অহনার এই পরিবর্তন?

স্ট্যান্ড ফ্যানটা ঝপ করে থেমে গেল। লোডশেডিং। গত কয়েক দিন খুব বেড়েছে, ঘনঘন যাচ্ছে বিদ্যুৎ। বেশিক্ষণের জন্য নয় অবশ্য, এসেও যায় অল্প সময়ে।

ডাটা সেভ করে কম্পিউটার বন্ধ করল অর্ঘ্য। দুটো বাজে, খিদেটা ভালই পেয়েছে। ছোট্ট একটা আড়মোড়া ভেঙে চেয়ার ছাড়ল। বেরিয়ে আসার আগে একবার তাকাল যন্ত্রপাতি তৈরির ঘরখানায়। মেয়েরা ফেরেনি এখনও, মেঝেয় ছড়িয়ে আছে মালপত্র। নাটবল্টু, স্ক্রুডাইভার, প্লাস, রেঞ্জ, শোল্ডারিং স্টিক...। গত পরশু এখানে কী কাণ্ডটাই না ঘটিয়েছিল সে! অহনা মাকে আনতে কলকাতায় গেল, তার হঠাৎ সাধ জেগেছিল ওই মেয়েগুলোর সঙ্গে বসে বানাবে সোলার ল্যাম্প। নিজের হাতে। কিন্তু ওই চেনা যন্ত্রপাতিগুলোও ঠিকঠাক ব্যবহার করা যে কী কঠিন, একটা ল্যাম্প বানাতে গোটা দিনটাই

কাবার। তুলনায় মাইন পাতা কি কয়েকটা ডেটোনেটর ফিট করা তো নেহাত জলভাত। ইলা-মিতা-দিলারা-কেয়ারা পর্যন্ত তার নাজেহাল দশা দেখে মুখ টিপে হাসছিল সেদিন।

অর্ঘ্যর ঠোঁটে আবছা হাসি ফুটে উঠল। চোরা একটা শ্বাসও পড়ল যেন। একখানা সামান্য আলো বানানোর চেয়ে আস্ত একটা গ্রাম উড়িয়ে দেওয়া যে ঢের ঢের সোজা কাজ, এটুকু জানতে যে জীবনের কতগুলো বছর কেটে গেল!

ছোট্ট মাঠখানা পেরিয়ে বাড়ি ঢুকল অর্ঘ্য। শেফালি গ্রিল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সামান্য ভারভার গলায় বলল, "এত দেরি করো কেন? তুমি খেয়ে নিলে আমি একটু বিছানায় টানটান হতে পারি।"

অর্ঘ্য পরশু থেকেই দেখছে, শেফালির হাবভাবে যেন বদল ঘটেছে অনেকটা। সহজ আপ্যায়নের সেই সুরটা আর নেই। বরং ঈষৎ অসন্তোষই যেন প্রকট হয়ে উঠছে হঠাৎ হঠাৎ। অণুদির সামনে অবশ্য স্বাভাবিকই থাকে, আড়ালে আবডালে একটু যেন অন্যরকম হয়ে যায়। তাকে আর অণুদিকে নিয়ে কিছু সন্দেহ করে কি? তারা তো কোনও বেচালপনা করেনি বাড়িতে। কোথাওই করেনি, কখনই অসংযত হয়নি। তা হলে?

অর্ঘ্য অবশ্য হাসিমুখেই বলল, "সরি মাসি। অণুদি এত ডিউটি চাপিয়ে গেছে..."

"কাঁধে নিয়েছ কেন? তোমার নিজের কাজকর্ম শেষ?"

মৃদু হেসে উত্তরটা এড়িয়ে অর্ঘ্য সোজা নিজের খুদে গলতায়। সেখান থেকেই শেফালির ডাক শুনতে পেল, "স্নান পরে কোরো। আমি কিন্তু ভাত বেড়ে দিয়েছি।"

অগত্যা বাথরুম গমন স্থগিত। সুড়সুড় করে ডাইনিং টেবলে হাজির। ডাল, পটলভাজা বাটামাছের ঝাল সহযোগে সারছে ভোজন।

শেফালি টেবিলের ওপারে। খাওয়া দেখছিল অর্ঘ্যর। জিজ্ঞেস করল, "আর ভাত নেবে?"

শেফালিমাসির এই তুই থেকে তুমিতে উত্তরণ বড্ড কানে লাগে। দূরত্ব বাড়ানোর সচেতন প্রয়াস? অণুদিকে জানাতে হবে। থাক, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অণুদিকে বিব্রত করার কী দরকার। মা-মেয়েতে এখন অশান্তি নেই, দুম করে হয়তো বেঁধে যাবে।

মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে অর্ঘ্য বলল, "না গো মাসি। যা দিয়েছ তাতেই তো পেট জয়ঢাক হয়ে যাচ্ছে।"

"আমার মেয়ের জন্য খাটছ... না হয় দু'মুঠো বেশিই খেলে।" মোটেই হালকা নয়, বরং বেশ বিরস স্বরে বলল শেফালি, "যাক গে, আমি শুতে গেলাম। খাওয়া হলে থালা টেবিলে ফেলে রেখো না, রান্নাঘরে নামিয়ে দিয়ো।"

শেফালি চলে গেল। আঁচিয়ে উঠে অর্ঘ্য ঢুকেছে স্নানে। বৃষ্টিবাদলা হচ্ছে প্রায়ই, দুপুরের দিকে জলটা আর তত তেতে থাকে না, গা-মাথা ভিজিয়ে ভালই আরাম হয়। ঝাঁকড়া চুল তোয়ালেতে মুছতে মুছতে অর্ঘ্য বেরিয়ে দেখল ডাইনিং টেবলের পাখাটা ঘুরছে আপন মনে।

অর্থাৎ কারেন্ট এসে গেছে। উফ, কী স্বস্তি। ভরপেট খাওয়ার পর এখন একটা ভাতঘুম দিলে কেমন হয়? পাখা চালিয়ে বিছানায় গড়াতে গিয়েও মত বদলাল অর্ঘ্য। সারা সকাল বসে বসে গত বছরের এপ্রিল-মে শেষ হয়েছে, সবে আরম্ভ হয়েছে জুন, আরও ন-ন'টা মাস বাকি। এখন ঘুমোনো মানে অন্তত ঘণ্টা দেড়েকের জন্যে কাজের দফারফা। সন্ধেবেলা অণুদি ফিরলে তখন কী কৈফিয়ত দেবে অর্ঘ্য?

তার চেয়ে বরং সোফায় হেলান দিয়ে খানিক জিরোনো যেতে পারে। বাইরের ঘরে এসে অর্ঘ্য টিভি চালিয়ে দিল। ভলিউম কমিয়ে। পাছে শেফালির নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে। রিমোট হাতে আধশোওয়া হয়েছে। ঘুরছে এ চ্যানেল ও চ্যানেল।

আচমকা আঙুল স্থির। খবরে কী দেখাচ্ছে ওটা? তেজসের ছবি না? কী করেছে তেজস? তড়াক করে উঠে বসল অর্ঘ্য। অজান্তেই বাড়িয়ে দিয়েছে টিভির আওয়াজ।

সমাচারটা শুনে, ভিডিও ক্লিপিংস দেখে, অর্ঘ্য বজ্রাহত। গোয়েন্দা সূত্রে নাকি খবর মিলেছিল, ওড়িশার নয়াগড় জঙ্গলে আস্তানা গেড়েছে উগ্রপন্থীরা, আজ সকালে কমান্ডো বাহিনী সেই গুপ্ত ঘাঁটিতে হানা দেয়, বিপুল সংঘর্ষ হয়েছে দু' পক্ষের, গোলাগুলি চলেছে বিস্তর, আটজন উগ্রপন্থী নিহত হয়েছে। জখমের সংখ্যা চার। কম্যান্ডো বাহিনীর কেউই মারা যায়নি, তিনজন মাত্র আহত হয়েছে সংঘর্ষে। মৃত উগ্রপন্থীদের তালিকায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম তেজস সিং ওরফে বাবুরাম মারান্ডি ওরফে রামু ভার্গব ওরফে শংকরন নায়ার। সরকারের দাবি, উগ্রপন্থী দমন অভিযানে গত চব্বিশ মাসে এটাই নাকি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। তেজস সিং-এর কর্মকাণ্ডেরও বর্ণনা দিচ্ছে টিভি রিপোর্টার। গত বছরে ট্রেনলাইনে নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে আঠাশ জনের প্রাণহানি ঘটানো, আট মাস আগে মধ্যপ্রদেশে পুলিশফাঁড়ি আক্রমণ করে সাতজন পুলিশ খুন, দেড় মাস আগে ঝাড়খণ্ডে অ্যাম্বুলেন্স উড়িয়ে চালক-রোগী সমেত পাঁচজনকে হত্যা, অতি সম্প্রতি কোরাপুটে...

শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল অর্ঘ্যর। তার মাইন পেতে অ্যাম্বুলেন্স ওড়ানোর কেসটাও তেজসের ঘাড়ে চেপে গেছে! এ তো এক দিক দিয়ে ভালই হল, নয় কি? কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, তার দীর্ঘদিনের কমরেড, অনেক সুখদুঃখের সাথী, তেজস আর নেই! দিল্লির জে-এন-ইউতে প্রথম পরিচয়, তেজসের ডাকেই পার্টিতে যোগ দিয়েছিল অর্ঘ্য, বস্তারের জঙ্গলে একসঙ্গে দু'জনে অস্ত্রচালনার ট্রেনিং নিল, কত লড়াইয়ে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নিয়েছে...। কয়েক মাস ধরে তেজস অবশ্য কেমন পালটে যাচ্ছিল। পার্টিতে অর্ঘ্যর অনুগামীর সংখ্যা বাড়ছে, কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং-এও অর্ঘ্যর কথা বেশি গুরুত্ব পায়... এতে যেন বিরক্ত হচ্ছিল তেজস। শেষমেশ তো অর্ঘ্যকে পয়লা নম্বর শত্রু ঠাউরে...।

তবু... তেজসের নিথর শরীর... জঙ্গলের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে..., গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে...! তেজস তাকে যাই ভাবুক, একসঙ্গে অনেকটা পথ তো তারা পাশাপাশি হেঁটেছিল।

তেজসের মৃতদেহ দেখাচ্ছে বারবার। ভাল লাগছে না। একটুও ভাল লাগছে না। টিভি অফ করে ঝুম বসে রইল অর্ঘ্য। দু' আঙুলে টিপছে রগ। আপন মনে মাথা ঝাঁকাচ্ছে জোরে জোরে।

সহসা মগজে বিদ্যুতের ঝিলিক। তেজসকে নিয়ে তো শোক করা বৃথা। বরং যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এ তো শাপে বর। তেজসের মৃত্যু কি নতুন সম্ভাবনা খুলে দেয়নি? রাজন, সৌরভ, গণেশন, পানিক্কাররা নিশ্চয় এখন দিশেহারা, অর্ঘ্যকে তারা সম্ভবত মেনেও নেবে...। দলটাকে যদি আবার নতুন করে গড়া যায়...? অর্ঘ্য নিশ্চিন্তে নিজের মতো করে দল চালাবে...। তত্ত্বে বদল ঘটিয়ে... শ্রেণিসংঘর্ষ থেকে ব্যক্তিহত্যার অংশটা ছেঁটে ফেলে...?

নাহ, মতাদর্শ নিয়ে লড়ালড়ি পরে হবে, বাকি সব্বাইয়ের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করাটাই এখন মুখ্য কাজ। পার্টির বিপন্ন দশায় সে যদি কমরেডদের পাশে না দাঁড়ায়, তাদের ভরসা না জোগাতে পারে, কী করে তাদের নেতা হবে অর্ঘ্য? আর এক মুহূর্ত নষ্ট করা নয়, আজই বেরিয়ে পড়া দরকার। এক্ষুনি। বেলপাহাড়ির উদ্দেশে। ওখানকার ঘাঁটিতে পৌঁছে একে একে সকলকেই বার্তা পাঠাবে সে, আবার বাঁধবে জোট...।

ঝটিতি ঘরে গেল অর্ঘ্য। খাটের নীচ থেকে টানল ঝোলা, ঝটাঝট পুরছে নিজের জিনিসপত্র। ঢোকাল ল্যাপটপ, বই, ছড়ানো জামাকাপড়, এমনকী ভিজে তোয়ালেটাও পলিথিনে মুড়ে চালান করল অন্দরে। হাত চালিয়ে পরখ করে নিল, রিভলভারখানা ঠিক জায়গায় রাখা আছে কি না। ভাগ্যিস অণুদিকে মেশিনটা জমা করে দেয়নি!

জিন্‌স-টি-শার্ট গলিয়ে, ঝোলা পিঠে চাপিয়ে অর্ঘ্য প্রস্তুত। নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কী ভেবে ঘুরে এল। শেফালি-অহনা তার প্রতীক্ষায় অনেক রাত অবধি গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে, উদ্বিগ্ন হয়ে চতুর্দিকে খোঁজাখুজি শুরু করবে... সে ভারী বিশ্রী ব্যাপার।

শেফালির দরজায় এসে কণ্ঠগ্রাম সামান্য উঁচুতে তুলে অর্ঘ্য ডাকল "মাসি...।"

ফল হয়েছে। চোখ খুলে তাকাল শেফালি, "কী হল?"

অর্ঘ্য বিনা ভূমিকায় বলল, "আমি চলে যাচ্ছি।"

শেফালি উঠে বসল। চোখ রগড়ে বলল, "কোথায়?"

"যেখান থেকে এসেছিলাম, সেখানেই। আমার এখানের কাজ ফুরিয়ে গেছে তো।"

শেফালি সামান্য থতমত, "আমার ওপর রাগটাগ করে যাচ্ছ না তো? আমি কিন্তু তোমায় যেতে বলিনি।... তুমি হলে গিয়ে এখন অণুর স্পেশাল অতিথি..."

"ছাড়ো না মাসি।...তুমি কি আমার কম আদরযত্ন করেছ... আমার চিরকাল মনে থাকবে..."

"আমার সৌভাগ্য। সাবধানে যেয়ো।"

বাধ্য ছেলের মতো অর্ঘ্য ঘাড় নাড়ল। ঘুরতে গিয়েও থমকাল। পকেট থেকে কাগজের একটা ছোট্ট মোড়ক বার করে দিল শেফালির হাতে।

শেফালি অবাক স্বরে বলল, "কী এটা?"

"অণুদির একটা পুরনো সিমকার্ড। আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিল। ওটা আর আমার লাগবে না। অণুদিকে ফেরত দিয়ে গেলাম।"

"ও।...ঠিক আছে, দিয়ে দেব।"

"অণুদিকে বোলো, তাড়া ছিল বলে ওয়েট করতে পারলাম না। অণুদি যেন কিছু না মনে করে...।"

"বলে দেব'খন। এসো।" কপালে হাত ঠেকাল শেফালি। "দুগ্গা, দুগ্গা...।"

অর্ঘ্যর জন্য শুভকামনা? নাকি অর্ঘ্য বিদেয় হলে বাঁচে মহিলা? ঠিক বুঝতে পারল না অর্ঘ্য। বোঝার তার সময়ও নেই। স্নিকার পরা পা চালিয়ে আশাবরীর কম্পাউন্ড ছাড়ল। মুহূর্ত ভাবল কী যেন, তারপর ধরেছে নদীর পথ।

সাড়ে তিনটে বাজে। রাস্তায় লোকজন নেই। চেনামুখের সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ না হওয়াই মঙ্গল, পালানোর চিহ্ন থেকে যাবে। লাভ একটাই, পরে কখনও পুলিশ এলেও তার রুট আন্দাজ করতে গিয়ে খানিক ঘোল খাবে।

নদীতে আজ তিন-চারটে নৌকা। দুলাল নেই, থাকলেও তার নৌকায় উঠত না অর্ঘ্য। কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা নেমে এল প্রথম নৌকার পাটাতনে। বুড়োমতো মাঝিকে বলল, “কী গো ভাই, যাবে তো?”

মাঝি হাই তুলল, “কোথায় কত্তা?”

“ওপারে।”

“ওই চরে?...তিরিশ টাকা পড়বে।”

পলকে চিন্তার টোকা। টাকার জন্য নয়। ভেবেছিল, চরে পাক মেরে সরাসরি ওপারে গিয়ে উঠবে। এখন মনে হচ্ছে, এই মাঝিকে নিয়ে চর অবধি যাওয়াই নিরাপদ। চরের ওপার থেকে ফের নৌকা ধরবে, লোকটা আর হদিশ দিতে পারবে না অর্ঘ্যর।

অর্ঘ্য ঘাড় নাড়তেই মাঝি নৌকা ছাড়ল। পার্স খুলে তিনখানা দশ টাকার নোট বার করে অর্ঘ্য রাখল পকেটে, সেই সঙ্গে একবার নিরীক্ষণ করে নিল পয়সাকড়ির হাল। হাতখরচা বাবদ ক’দিন আগে হাজার টাকা পকেটে গুঁজে দিয়েছিল অণুদি। বলেছিল, মাগনা তোকে খাটাব কেন, কিছু অন্তত রাখ। বোঝহয় পার্সের হাল দেখে অণুদির মায়া হয়েছিল। যাই হোক, ওই টাকার পুরোটাই আছে এখনও। এতেই অর্ঘ্য দিব্যি বেলপাহাড়ি পৌঁছে যাবে। কিন্তু তারপর? বেলপাহাড়ির শিবিরে খরচা নেই বটে, কিন্তু সেখান

থেকেও যদি কোথাও যেতে হয়? বেলপাহাড়িতে এখন টাকার জোগাড় কেমন কে জানে! ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা টাকাই আদায় হচ্ছিল, এখন অর্ঘ্যদের ছত্রভঙ্গ দশায় তারাও না বেঁকে বসে। ভয় না পেলেই তো বিপদ, অর্ঘ্যদের অস্তিত্ব ঝুরঝুর হয়ে যাবে।

চিন্তাটা বাজল অর্ঘ্যর মাথায়। ভবিষ্যৎ রাস্তা স্থির করার আগে এই কথাটা প্রথম মনে পড়ল কেন? আদর্শ নয়, ভয় দেখানোর ক্ষমতাই কি তাদের একমাত্র মূলধন এখন? রাজনদের কি অর্ঘ্য বলতে পারবে, সেস আদায় বন্ধ করো? টাকা আসবেই বা কোত্থেকে? অস্ত্র, গোলাবারুদ, মাইন, ডিনামাইটের খরচা নেই? প্লাস, এতজন কমরেডের খাওয়া-দাওয়া, এখানে ওখানে ছোটা, নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ, পোস্টার ছাপানো...

নৌকা কখন যে মাঝনদী পেরিয়ে গেছে অর্ঘ্য টেরই পায়নি। আষাঢ় মাস পড়েছে আজ। মেঘলা আকাশ, মায়া ছড়ানো আলো, নদীর টলটলে শোভা, আজও সবই মজুত, অথচ অর্ঘ্যর নজরে পড়ছে না। একটা বড় নৌকা গেল পাশ দিয়ে, ঢেউ এসে দুলিয়ে দিল অর্ঘ্যদের, মালুমই হল না অর্ঘ্যর। হৃদয়ের অস্থিরতা বুঝি অনেক স্বাভাবিক অনুভূতিকেও অসাড় করে দেয়।

মাঝিকে ভাড়া মিটিয়ে চরে নামল অর্ঘ্য। তরতরিয়ে উঠে এল উঁচু পাড়ে। ঘুরে একবার দেখল আলাইপুর। তখনই অর্ঘ্যর মনে পড়ে গেল সেদিন রাতে ঠিক এখানটাতেই এসে দাঁড়িয়েছিল না? আবছা দুলে গেল স্মৃতি। পা যেন সহসা অবশ। এখনও যেন সেই ছোঁয়া লেগে আছে শরীরে। ভেজা নরম এক দেহ অর্ঘ্যর বুকে আশ্রয় খুঁজছিল!

ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে অর্ঘ্য এগোল আবার। দল তাকে ডাকছে, ছিঁড়তে হবে পিছুটান। কিন্তু গিয়ে সে পৌঁছোবে কোথায়? পুরনো সেই জীবনে কি তার আস্থা অটুট আছে এখনও? বিশ্বাসই তো চিড় খেয়ে গেছে, নয় কি?

আবার অর্ঘ্যর পা আটকে গেল। ওই তো সেই গোয়ালঘরের লাগোয়া চালা! ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দড়ির খাটিয়া! এখানে বসেই না অর্ঘ্য উচ্চারণ করেছিল, সে খুন-খারাবির পথ ত্যাগ করতে চায়? তবে আজ সে কেন চলেছে? দলপতি হওয়ার সুযোগ মিলতে পারে বলে? তেজসের সঙ্গে অর্ঘ্যর ফারাকটা কোথায়? মারণযজ্ঞের নিষ্ঠুর পুরোহিত সাজার উত্কট মোহ আবার কি তার চেতনাকে ঘুলিয়ে দিচ্ছে না?

অর্ঘ্য দাঁড়িয়েই আছে। কোনটা বাছবে সে? হিংসা না ভালবাসা? ধ্বংস না নির্মাণ? এক অলৌকিক রাত তাকে নতুন স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল, সেই রাতটাকেই অর্ঘ্য মিথ্যে করে দেবে?

অর্ঘ্য হঠাৎ দৌড়োতে শুরু করল। চরের ওপার পানে নয়, উলটো মুখে। পাড়ে পৌঁছে হাঁপাচ্ছে। মাঝি আর ঘাটে নেই, তাকে পৌঁছে দিয়ে চলে যাচ্ছে আলাইপুর।

অর্ঘ্য প্রাণপণে চেঁচাল, “অ্যাই, শুনছ? শুনছ...?”

নৌকা প্রায় নাঝনদীতে, তবু বুঝি মাঝির কানে গেছে ডাক। লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে পাটাতনে। দু’হাত তুলে জানতে চাইছে কেন এই আহ্বান।

চিৎকার করতে গিয়ে অর্ঘ্যর গলা প্রায় চিরে গেল, “আমি ফিরতে চাই, মাঝি। আমি ফিরতে চাই।”

অর্ঘ্যর আর্তি ছড়িয়ে গেল চরাচরে। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুলছে। জলকে ছুঁয়ে মিশে যাচ্ছে প্রথম আষাঢ়ের মেদুর বাতাসে।

.

॥ ১২ ॥

হালকা একটা উদ্বেগ নিয়ে ফিরেছিল অহনা। কলকাতায় কাজ শেষ করে একবার সুশোভন স্যারের স্ত্রীকে দেখে আসবে ভেবেছিল আজ। হল না। স্যারই নিষেধ করলেন। গীতালি আন্টিকে নিয়ে এখন রোজই যেতে হচ্ছে হাসপাতালে, কখন ফিরবেন তার ঠিক নেই। সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন চলছে

ডায়ালিসিস, উন্নতির সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর ক্রমশ। স্যার একটা অনুরোধ জুড়লেন আজ। স্যারের অনাথ আশ্রমটা যদি মাঝে মাঝে অহনা একটু দেখে আসে, উনি নাকি খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

নিজের কাজকর্ম সামলে কখন যাবে? নাকি অর্ঘ্যকেই দেবে দায়িত্বটা? এই নিয়েই দোটানা চলছিল অহনার মনে। কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই যা শুনল, অনাথ আশ্রম উবে গেল মগজ থেকে। উলটে দুম করে তেতে গেল মাথা।

অহনা বিরক্তিতে ফেটে পড়ল, "তুমি অর্ঘ্যকে যেতে দিলে? আটকালে না?"

"আমি তাকে বারণ করার কে অণু?" শেফালির স্বর নির্বিকার, "সে নিজের ইচ্ছেয় এখানে এসেছিল, দরকার ফুরোতেই চলে গেছে। এতে আমার কী করার আছে?"

"তুমি আমায় একটা ফোন করেও তো জানাতে পারতে, নয় কি?"

"সে তোমার অর্ঘ্যও তো ফোন করতে পারত, নয় কি? তা ছাড়া আমার মনেও হয়নি, অর্ঘ্য চলে গেলে তোমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে।"

"ওফফ মা, তুমি বুঝতে পারছ না।" অহনা অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকাল। উত্তেজিত ভাবে বলল, "ও কি এমনি এমনি এখানে ছিল? ও কত বিপদের মধ্যে আছে জানো?"

শেফালি সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল, "কেন? কী করেছে ছেলেটা? খুন-জখম? চুরি রাহাজানি?"

অহনা ভুরু কোঁচকাল, "ওকে দেখে কি ওই ক্লাসের ছেলে মনে হয়?"

"দেখে কি আর আজকাল মানুষ চেনা যায়? যাকে সভ্য-ভব্য বলে মনে হয়, পরে দেখা যায় সে একটি আস্ত শয়তান।"

বলতে না চেয়েও অহনার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, "সুগতকে দিয়ে সবাইকে বিচার কোরো না মা।"

“সুগতকে টানছ কেন? তুমি ভাল করেই জানো, আমি সুগতর কথা বলিনি।” শেফালি এবার রীতিমতো গম্ভীর, “তা তোমার অর্ঘ্যবাবুটি কী মহান কাজ করেছেন শুনি? যার জন্য তাকে এখানে ঘাপটি মেরে থাকতে হয়েছিল?”

অহনা ব্যাখ্যাতে গেল না, তর্কতেও নয়। মা অর্ঘ্যকে বুঝতে পারবে না, উলটে ওর রাজনীতির কথা শুনলে হয়তো ভির্মি খাবে। অহনা সোফায় হেলান দিয়ে ভাবার চেষ্টা করল, হঠাৎ কেন এই প্রস্থান। আসানসোল থেকে কোনও খারাপ খবর পেয়ে...। কিন্তু কালও তো অহনার ফোন থেকে বাবাকে কল করেছিল অর্ঘ্য, তখন পূজার সঙ্গে কথাও হল অহনার। পূজা বলল, ওষুধে মা সাড়া দিচ্ছে, মাঝে মাঝে চিনতেও পারছে আপনজনদের। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমন কী খারাপ হতে পারে? মোবাইলে তো নম্বরটা আছেই, একবার ফোন করে দেখবে অহনা? তা হলে খানিকটা অন্তত নিশ্চিন্ত হতে পারে।

মোবাইল হাতে নিয়েও অহনা মত বদলাল। যদি আসানসোলে কিছু না ঘটে থাকে? অর্ঘ্য আলাইপুরে অহনার বাড়িতে আছে জেনে বহুকাল পর একটু স্বস্তি পেয়েছেন মেসোমশাই, ছেলে আবার নিরুদ্দেশ শুনলে প্রতিক্রিয়া শুভ হবে কি? কিন্তু সিম কার্ডটা রেখে গেল কেন? নিজের সিম ব্যবহার করতে পারছে না, ডুপ্লিকেটটাও না, তাই তো অহনা তার পড়ে থাকা একটা সিম কার্ড অর্ঘ্যকে দিয়েছিল। এখন তার মানে অর্ঘ্য প্রায় বিনা মোবাইলেই...। এমন অবস্থায় বেরিয়ে গেল আলাইপুর ছেড়ে? কী এমন জরুরি প্রয়োজন পড়ল?

শেফালি পাশেই বসে। অহনা ঘাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “এখান থেকে কোথায় গেল, কিছু বলেনি?”

“হেঁয়ালিমার্কা কী একটা যেন বলেছিল বটে।” শেফালি ভাবল দু’-এক সেকেন্ড। তারপর বলল, “হ্যাঁ... যেখান থেকে এসেছিলাম, সেখানেই ফিরে যাচ্ছি।”

ভুরুর ভাঁজ বাড়ল অহনার। কলকাতা থেকে এসেছিল অর্ঘ্য, মানে ফের কলকাতায়। কিন্তু কলকাতার ডেরায় নাকি আর যাওয়া সম্ভব নয়... অর্ঘ্যই তো বলছিল...।

কে যেন দিদি দিদি করে ডাকছে বাইরে থেকে? অহনা প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এল। বিশ্বজিৎ।

অহনা বুকের শ্বাসটা চেপে বলল, "কী হয়েছে?"

বিশ্বজিৎ কাঁচুমাচু মুখে বলল, "মেজদি এখন কয়েক দিন কাজে আসতে পারবে না।"

"কেন?"

"রোজ সন্ধের সময়ে জ্বর আসছিল। আজ রক্ত পরীক্ষা করানো হয়েছে। একটু আগে রিপোর্ট এল। ম্যালেরিয়া। ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়েছেন। উনিই বললেন মেজদিকে ক'দিন বিশ্রাম নিতে।"

"ও। কেমন আছে জানিয়ে যেয়ো।"

বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নেড়ে চলে যেতে গিয়েও ঘুরল বিশ্বজিৎ। ঈষৎ কৌতূহলী মুখে বলল, "অর্ঘ্যদা আজ চলে গেলেন বুঝি?"

ধক করে অহনার বুকে বাজল প্রশ্নটা। আলাইপুরের সব্বাই বোধহয় খবরটা জানে, একমাত্র অহনা ছাড়া। কেন? অহনা কী অক্টোপাস হয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে অর্ঘ্যকে বাঁধছিল? কেটে পালিয়ে মুক্ত হল অর্ঘ্য? কী অপমান!

নাহ, নিজের কষ্ট নিজের বুকেই থাক, অন্যকে তা কেন টের পেতে দেবে অহনা?

স্মিতমুখে অহনা বলল, "তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি?"

"উনি বোধহয় আমাকে খেয়াল করেননি। নদীর ধারের কালীমন্দিরে গেছিলাম, দেখলাম উনি পিছনে ঝোলা নিয়ে নৌকোয় উঠছেন।"

"ও।"

"নৌকা পার হয়ে কোথায় গেলেন? হুগলি? ওদিকে ওনার কেউ থাকে?"

অহনার গলা ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল, আমি জানি না। কিন্তু সুভদ্র স্বরই ফুটল, “হ্যাঁ, ওর মামার বাড়ি।”

“জিরাটের দিকটায়? নাকি সোমরা বাজার সাইডে?”

অল্প হেসে হ্যাঁ না এড়িয়ে অহনা বলল, “এইমাত্র কলকাতা থেকে ফিরেছি, খুব ক্লান্ত... একটু জিরিয়ে নিই...?”

ইঙ্গিতটা বুঝেছে বিশ্বজিৎ। অপ্রতিভ মুখে বলল, “সরি দিদি। আসছি।”

ছেলেটা চলে যাওয়ামাত্র মগজে দপদপ। এবার যেন অর্ঘ্যর কথার অর্থটা স্পষ্ট হচ্ছে। কলকাতা যায়নি অর্ঘ্য। তার মানে আবার সেই পুরনো পথে...? এত প্রতিশ্রুতি, এত ডায়লগবাজি, সব ভান? ওইসব বলে কয়েকটা দিন কাটিয়ে গেল শুধু? অহনা কিচ্ছুটি বুঝতে পারল না? তার ভালবাসা এইভাবে প্রত্যাখ্যান করল সেটা বড় কথা নয়, নিজের জীবনটাকে সেই সর্বনাশের দিকেই ছোটাল শেষমেষ। এটাই বোধহয় অহনার সবচেয়ে বড় হার। ওহহ, বাঁচাতে পারল না অর্ঘ্যকে সে কোনও মতেই!

মাথা নিচু করে শোওয়ার ঘরে এল অহনা। দরজায় শেফালি। তীক্ষ্নচোখে নিরীক্ষণ করছে মেয়েকে। বলল, “ফালতু ফালতু ছেলেটাকে নিয়ে কেন ভাবছিস? যা স্নান করে নে।”

অহনা নিরুত্তর। কী তার ভাবনা, মা বুঝবে কেমন করে?

শেফালি আবার বলল, “গেছে তো আপদ চুকেছে। যে দুষ্কর্মই সে করে থাকুক, আমাদের এখানে থাকলে তো আমরাও জড়িয়ে যেতাম। ঠিক কিনা? তা ছাড়া...”

“গোঁৎ খেলে কেন? তা ছাড়া কী?”

“আমরা মায়ে-ঝিয়ে এখানে দিব্যি ছিলাম। একটা উটকো দামড়া ছেলে এসে ঘাড়ে বসে অন্ন ধ্বংস করছিল...”

“বাজে বোকো না মা। ও আমার আশাবরীর অনেক কাজ করে দিচ্ছিল।”

“আহা রে মরে যাই।... অর্ঘ্য আসার আগে আশাবরী বুঝি চলছিল না?”

“আরও ভাল করে চলত। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, ও পাকাপাকি ভাবে এখানে থাকবে, আমরা দু’জনে মিলে আশাবরীকে অনেক বড় করব...”

“অ্যাদ্দুর গড়িয়েছে, অ্যাঁ।” শেফালি ঝনঝন করে উঠল, “সুগত তা হলে ঠিকই আন্দাজ করেছিল। সাধে কি আমি ঘি-আগুন পাশাপাশি রেখে যেতে চাইনি।”

অহনা ধাক্কা খেয়েছে একটা। কড়া গলায় বলল, “হঠাৎ সুগত পিকচারে এল কোত্থেকে?”

“তুই ভাবিস, কলকাতা গেছি বলে আলাইপুরের কোনও খবর রাখি না? সুগত এখানে এসেছিল? অর্ঘ্যকে দেখে গেছে?”

“হ্যাঁ। তো?”

“পর দিনই বেহালায় গিয়েছিল। দুঃখ করে বলল, আপনার মেয়ে কিন্তু কাজটা ঠিক করছে না। আমার ওপর রাগ দেখিয়ে ও কিন্তু একটা কেলেঙ্কারি বাধাতে চলেছে।”

কী স্পর্ধা! কী সীমাহীন নির্লজ্জতা? মা কি অন্ধ? বোবা? কালা? ওই কথাটা বলার সময় ঠাস ঠাস করে চড় কষাতে পারল না? অবশ্য মা তো বোধহয় সুগতর নোংরামিতে দোষ দেখে না? সুগত পুরুষমানুষ যে! অর্ঘ্যকে সে ভালবাসে এতে তো মা পাপ দেখবেই?

বেশ কয়েক দিন পর হিংস্র রাগটা মাথা চাড়া দিয়েছে। স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিল অহনা। কীভাবে আক্রমণ শানাবে, ঠিক করতে পারছিল না।

মোবাইল বাজছে। এই সময়েই কল আসতে হয়?

মনিটরে অচেনা নম্বর। বিরক্ত ভাবেই অহনা বলল, “কে? কী চাই?”

ওপারে চাঁচাছোলা স্বর, “টিয়াডাঙা পুলিশ স্টেশন থেকে বলছি। আপনি কী অহনা চৌধুরী?”

“হ্যাঁ। কেন বলুন তো?”

“খানিকক্ষণ আগে একজন উগ্রপন্থী নেতা আমাদের থানায় এসে সারেন্ডার করেছেন। নাম অর্ঘ্য রায়। আপনি কি তাকে চেনেন?”

ক্ষণপূর্বের রাগ, বিরক্তি পলকে নিশ্চিহ্ন। অহনা উদগ্র ভাবে বলল, “হ্যাঁ চিনি, ভীষণ ভাবে চিনি।”

“উনিও তাই দাবি করছেন। ফোনটাও উনিই করতে বললেন।”

“ও। অর্ঘ্য এখন...”

“আমাদের হেপাজতে। অর্ঘ্যবাবু আপনার সঙ্গে একবার মিট করতে চাইছেন। ইউজুয়ালি এই ধরনের কেসে আমরা কাউকে দেখা করতে দিই না। তবে আমরা আপনাকে চিনি... সো ইউ মে কাম। আপনাকে আমাদের কিছু কোশ্চেনও আছে... আশা করি আপনার কো-অপারেশন পাব...।”

“আমি এক্ষুনি আসছি।”

“তাড়া নেই। ইনফ্যাক্ট, রাত্রে কোনও মহিলাকে থানায় আসার জন্য বলতেও পারি না। কাল ফার্স্ট আওয়ারে অর্ঘ্য রায়কে রানাঘাট কোর্টে তোলা হবে। সো... সকাল আটটার মধ্যে এলেই চলবে।”

অসম্ভব। সারা রাত সে এখন অপেক্ষা করতে পারবেই না। যদি আজ রাতেই অহনা মরে যায়, জীবনে তো আর দেখাই হবে না! অহনা এত বড় ঝুঁকি নেয় কোন ভরসায়? তা ছাড়া এক রাতের নিদ্রাহীন প্রতীক্ষা তো হাজার বছরের চেয়েও দীর্ঘ, এ কি পুলিশ অফিসারটির ঘিলুতে আছে!

অদ্ভুত এক শিহরন বইছে অহনার সর্বাঙ্গে। পারেনি, অর্ঘ্য তাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। পুরনো পথে ফিরতেও না। পুলিশ স্টেশন আর নদী যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ, অহনার চেয়ে বেশি কে জানে!

এই রাত্রিবেলায় কোথায় যাবে, কেন না গেলেই নয়, ঠান্ডা গলায় শেফালিকে বলল অহনা। শেফালির বিমূঢ় দৃষ্টি মেখে বেরিয়ে পড়ল মোপেড নিয়ে।

চলেছে অহনার মোপেড। আঁধার চিরে। অভিসারে। পুলিশের গুহায়।

.

॥ ১৩ ॥

দুপুর বারোটা চল্লিশে রায় ঘোষণা করলেন বিচারপতি। কী বলবেন তা মোটামুটি জানাই ছিল অহনার। অর্ঘ্য তার প্রতিটি নাশকতামূলক কাজের দায় স্বীকার করেছে, সুতরাং সাজা তো তার হবেই। রাজসাক্ষী হয়ে বাকি কমরেডদের ফাঁসিয়ে দিলে হয়তো বেকসুর খালাসও মিলত, পুলিশ তাকে সেরকম আশ্বাস দিয়েও ছিল, কিন্তু অর্ঘ্য তো সে পথে হাঁটেনি। অতএব দণ্ডের মাত্রা যে নেহাত কমবে না, এও তো অবধারিত।

অরবিন্দও এসেছিল কোর্টে। অর্ঘ্যর মা অনেকটাই সুস্থ, তাই শুনানির সময়ে সে অনেক দিনই থেকেছে অহনার পাশে। আজ ছেলের শাস্তির পরিমাণটা শুনে সে রীতিমতো বিমর্ষ।

উকিলের সঙ্গে কথা সেরে কোর্টের বাইরে এল দু'জনে। অরবিন্দ বলল, "জজটার দয়ামায়া নেই। আরেকটু হালকা পানিশমেন্ট দিতে পারত।"

দীর্ঘ পাঁচ-ছ'মাসের ছোটাছুটির পরিসমাপ্তি হল আজ। একটা বড়সড় অধ্যায় চুকল। শরীরটা ছেড়ে যাচ্ছে যেন। অহনা একটা শ্বাস ফেলে বলল, "কিছু তো করার নেই মেসোমশাই। মেনে তো নিতেই হবে।"

"হায়ার কোর্টে গেলে হয় না? যদি খানিকটা রেমিশন মেলে? নইলে ছাড়া পাওয়ার পর আর কি মায়ের সঙ্গে ওর দেখা হবে?"

"দেখুন কী করবেন?"

"তুমিই বলো না, কী করি?" অরবিন্দর স্বরে অনুনয়, "তোমার ডিসিশনই আসল।... তুমি যা করেছ... ফ্র্যাঙ্কলি বলছি ওর নিজের দিদিও এতটা..."

অহনা মনে মনে হাসল। দিদি নয় বলেই না সে এতটা জড়িয়ে পড়েছে! অর্ঘ্য আর অহনা পরস্পরকে কী চোখে দেখে জানলে এই অরবিন্দই যে তার কৃতজ্ঞ রূপটি বদলে ফেলে ভিন্ন মূর্তি ধরবে, এও তো

সত্যি। নিজের মাকে দেখেই তো বুঝছে অহনা? এত মাস হয়ে গেল, মাঝে কত কী ঘটে গেল, এখনও কি মা তার মেয়ের গায়ে কালি ছেটাতে কসুর করছে?

অহনা আলগাভাবে বলল, “আমার মত যদি নেন তো বলব অর্ঘ্যর ইচ্ছেটাকেই মেনে নিন।”

“ও তো অ্যাপিলে যেতে রাজি নয়...”

“ঠিক। ও যখন রেহাই চায় না, কেন মিছিমিছি ওর ওপর জোরজবরদস্তি চালাবেন?”

কথাটা একেবারেই পছন্দ হয়নি অরবিন্দের। পলকে মুখ গোমড়া। বলল, “দেখি, একবার খুকির বরের সঙ্গেও কথা বলি...।”

অহনা আমল দিল না। গত কয়েক মাসে অর্ঘ্যর আপনজনদের নানান চেহারা দেখল কিনা। যে যেভাবে পারে, সম্পর্ক অস্বীকার করছে। পাশে পুলিশের হ্যাপা সইতে হয়! এখন তাদের পরামর্শ যদি মূল্যবান মনে হয়, তো অতি উত্তম। অর্ঘ্যকে এখনও এরা কেউ চিনলই না! এমনকী অর্ঘ্যর বাবাও না? আগ বাড়িয়ে অহনা আর কিছু বলবেই না।

মোবাইলে সময় দেখে অহনা বলল, “আপনি কি আজ আসানসোল ফিরবেন?”

“হ্যাঁ, ইন্টারসিটি ধরব।” অরবিন্দ ঘাড় নাড়ল, “তার আগে একটু কেনাকাটা আছে...”

“বেশ তো। আমি তা হলে আসি।”

বাস ট্রাম নয়, ট্যাক্সি ধরে অহনা সোজা শিয়ালদায়। কপাল ভাল, রানাঘাট লোকাল ছাড়ছে, ভিড়টাও সহনীয়। উঠে বসার সিটও মিলেছে।

ট্রেন দমদম পেরোতেই বাতাসে হালকা ঠান্ডার আমেজ। হেমন্ত অনেকটা গড়িয়ে গেছে, অঘ্রানের শুরুতেই এবার হাওয়ায় হিমকণার আভাস। দোপাট্টাখানা গলায় জড়িয়ে নিল অহনা। বছরের এই সময়টাই মারাত্মক, একটু বেখেয়াল হলেই বিছানায় আছড়ে ফেলবে। পুজোর আগে আগে গীতালিআন্টি চলে গেলেন, স্যার এখনও শোক সামলে পুরনো জোশে ফিরতে পারেননি, অনাথ

আশ্রমের অনেকটা দায়িত্ব এখনও অহনার কাঁধে। ওদিকে মিস্ত্রি লেগেছে আশাবরীতে, পুরোদমে চলছে কাজ, শেষ না হলে সোলার প্যানেল তৈরির ইউনিটটা চালু করা যাচ্ছে না। অহনার কি এই সময়ে অসুখ বাধানোর শৌখিনতা সাজে?

একটা মিনি দঙ্গল উঠেছে ব্যারাকপুরে। বোধহয় একই অফিসের, দুপুর না ফুরোতেই অফিস কাটল কী করে কে জানে! ঠেসেঠুসে বসে পড়ল কয়েকজন, চেঁচিয়ে গল্প জুড়েছে নিজেদের মধ্যে। খেলা রাজনীতি ঘুরে ঢুকে পড়ল সুগত চৌধুরীর শ্রাদ্ধকর্মে। উত্তেজিত গলায় পিন্ডি চটকাচ্ছে সুগতর।

অহনার এই হয়েছে এক ফ্যাসাদ। বেশ কিছুদিন ধরেই সুগতর ব্লু হোয়েল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস নিয়ে বাজার গরম হচ্ছিল, কত হাজারে হাজারে লোক নীলতিমির গ্রাসে পড়ে সর্বস্ব হারিয়েছে তার খবর বেরোচ্ছিল কাগজে টিভিতে। হল্লাগুল্লার চাপে পড়ে অবশেষে গ্রেফতার করা হয়েছে সুগতকে। চন্দ্রাণীও ছাড়া পায়নি, সেও এখন শ্রীঘরে। এখন রোজই সুগতর নতুন নতুন প্রতারণার কাহিনি উন্মোচিত হচ্ছে জনসমক্ষে। ফলে পথেঘাটে, ট্রেনে বাসে সর্বত্রই সুগত এখন গরম তেলেভাজা। তার রইসি, নারীদোষ, লাখো মানুষকে টুপি পরানোর ফন্দিফিকির, সবই মহানন্দে চিবোচ্ছে জনগণ। মাঝে সাঝে অহনার প্রসঙ্গও আসে বই কী। সুগতর আসলি বউটা কোথায় ঘাপটি মেরে আছে, তাই নিয়েও পাবলিকের কৌতূহল কম নয়। নানান রসালো মন্তব্যও উড়ে আসে। বউটার মাধ্যমে নাকি বিদেশে টাকা পাচার করেছে সুগত কিংবা সেই বউটাই মালকড়ি ঝেঁপে ফোঁপরা করে দিয়েছে ... আরও কত কী...। এবং সুগতর উত্থানের ঢের আগে পালিয়ে আসা অহনাকে এসব গিলতেও হয়। এমনকী বাবার বন্ধু পুলিশের এক প্রাক্তন বড়কর্তার মাধ্যমে লালবাজারের এক জাঁদরেল অফিসারের কাছে আবেদনও করতে হয়েছে অহনাকে, যাতে তাকে টানাহ্যাঁচড়া না করে পুলিশ।

সুগতর ওপর ধকল যাচ্ছেও বটে। আজ এই কোর্ট, কাল ওই কোর্ট, আজ এই জেলা তো কাল ওই জেলা... চরকি খাওয়াচ্ছে পুলিশ। বেচারার ছবি বেরোয় কাগজে, সুন্দর সপ্রতিভ চেহারাটি এখন গাঁজাখোরের মতো দেখায়। অর্ঘ্য ওকে দুর্ভাগা বলেছিল? এই দিনটার কথা অনুমান করেই কি...?

নাহ, সত্যিই আর সুগতর ওপর রাগ নেই অহনার। বরং করুণাই হয়। একটু একটু মায়াও। কত গুণ ছিল, মোহমেঘ সবই ঢেকে দিল!

তবে একটা ব্যাপারে সুগতর কাছে অহনাকে ঋণ স্বীকার করতেই হচ্ছে। নীলতিমির আতঙ্কে ওরকম সমস্ত দু'নম্বরি কারবারেই এখন ভাটার টান। ফলে অহনার আলাইপুরের শ্যামাঙ্গিনীও আপাতত শীতঘুমে। উটকো উত্পাত থেকে জোর বেঁচে গেছে অহনা।

সুগতকে গাল দেওয়া ছেড়ে আবার রাজনীতিতে মত্ত হল দলটা। ঈষৎ কাটা হয়ে ছিল অহনা, স্বস্তি পেল যেন। চোখ মেলে দিয়েছে জানলার ওপারে।

বিকেল বিকেলই টিয়াডাঙা পৌঁছোল ট্রেন। মোপেডে ফিরছে অহনা। জনপদ পেরিয়ে ধরল ভাঙাচোরা রাস্তা। বুকটা চিনচিন করছিল অহনার। আসামির কাঠগড়ায় নতমস্তকে দাঁড়িয়ে ছিল অর্ঘ্য। রায় শুনেও মাথা তোলেনি। শুধু কোর্ট থেকে নিয়ে চলে যাওয়ার আগে গাঢ় চোখে অহনার পানে তাকিয়েছিল একবার, একবারই। এখনও যেন হৃদয়ের গহিন কুঠুরিতে জমে আছে সেই দৃষ্টি। কতকাল যে থাকবে!

সহসা থেমে গেছে মোপেড। আপনা আপনি। স্টার্ট দিতে চেষ্টা করল অহনা। উঁহু, মোপেড অনড়। হলটা কী?

অহনা নামল মোপেড থেকে। মিটারগুলো দেখতে গিয়েই মাথায় হাত। আজ রায় বেরোবে বলে মনটা ভারী বিক্ষিপ্ত ছিল কাল। প্রতি রাতে নিয়ম করে চার্জে বসায় গাড়ির ব্যাটারি, বেবাক ভুলে গেছে! সর্বনাশ কী হবে এখন? আরও তো প্রায় এক-দেড় কিলোমিটার বাকি। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যেতে হবে?

উপায়ও তো কিছু নেই আর। পেরোতেই তো হবে পথটুকু। মোপেড ধরে ধরে চলছে ধীরে। একটু গিয়েই টান পড়েছে দমে। একটা কালভার্ট পড়ল, মোপেড দাঁড় করিয়ে বসল অহনা। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে।

সামনেই এক দিগন্তছোঁয়া ধানখেত। পাকা ধান দুলছে বাতাসে। খেতের ওপারে অস্তগামী সূর্য। সোনালি আলো পড়ে হলুদ ধানও সোনাবরণ। কুয়াশা নামছিল খেতে, বিছিয়ে দিচ্ছিল নরম বিষাদ। নীলাভ বিষণ্ণতায় ভরে উঠছে চরাচর।

শ্রান্ত অহনার বুক নিংড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এখনও কতটা পথ পাড়ি দিতে হবে। অহনা পেরে উঠবে কি?

ওহ, দিনটাই বড় বিশ্রী যাচ্ছে আজ! দশ দশটা বছরের জন্য অর্ঘ্য চলে গেল গরাদের ওপারে!

তা কেন? আর এক অহনা ফিসফিস করছে কানে। দিনটা কী এমন মন্দ! আর দশটা বছর পরেই তো ফিরে আসছে অর্ঘ্য।

উবে যাচ্ছে ক্লান্তি। অনেকটা স্নিগ্ধ বাতাসে ফুসফুস ভরে নিয়ে অহনা উঠে দাঁড়াল। টানল মোপেড। এইটুকুই তো পথ। মাত্র দশটা বছর।

The End